দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

কাশীর স্বর্ণমন্দিরে
শিব-পার্বতীর বিয়ে
— পৃঃ ২৪

ভয়ঙ্কর আগ্নেয়গিরির
একটি মুখের নাম
সন্দেশখালি — পৃঃ ১১

৭৬ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা।। ১১ মার্চ, ২০২৪।। ২৭ ফাল্গুন, ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555

E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৬ বর্ষ ২৫ সংখ্যা, ২৭ ফাল্গুন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১১ মার্চ - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৫,
Website : www.eswastika.com

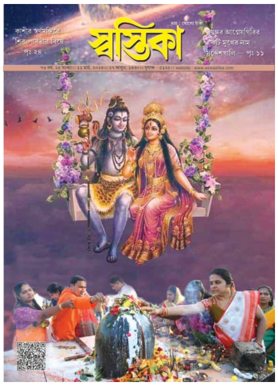

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা
সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল
প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :
সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)
সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫
সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩
দাম : ১৬ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957
দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

পশ্চিমবঙ্গের মর্যাদা কাদা মাটিতে মিশিয়ে মমতা—মাটি কাটি দংশে সর্প ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

মার সাংবাদিক মার ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

প্রতিটি ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পাচ্ছে দেশীয় শক্তি ◻ অনিল তিওয়ারী ◻ ৮

চীনের পাকিস্তানগামী পারমাণবিক পণ্য-পরিবাহী জাহাজ আটক ভারতীয় বন্দরে ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

পশ্চিমবঙ্গে সৃষ্টি হওয়া ভয়ংকর আগ্নেয়গিরির একটি মুখের নাম সন্দেশখালি ◻ সাধন কুমার পাল ◻ ১১

মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু হত্যা মানবতাবাদের সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছিল শাসক বামফ্রন্ট ◻ ড. রুবি সাঁই ◻ ১৩

মোক্ষম প্রশ্ন তুলেছেন শীর্ষ আদালত : উত্তরের অপেক্ষায় গোটা দেশ ◻ সুদীপনারায়ণ ঘোষ ◻ ১৬

নীলকণ্ঠ পাখি ◻ সৈকত চট্টোপাধ্যায় ◻ ১৮

কৃষিদেবতা শিব ◻ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ◻ ২৩

কাশীর স্বর্ণমন্দিরে শিব-পার্বতীর বিয়ে
◻ নন্দলাল ভট্টাচার্য ◻ ২৪

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রাণের উৎসব মহাশিবরাত্রি
◻ প্রদীপ মারিক ◻ ২৮

জ্ঞানগঞ্জের মহাযোগী শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
◻ ড. দেবনাথ মল্লিক ◻ ৩১

শিবের পছন্দের ফুল ‘হরবরই’ ◻ মিলন খামারিয়া ◻ ৩৪

কাশীর সারস্বত চর্চা ◻ ড. অপরূপ সান্যাল ◻ ৩৫

রামচরণ পাদুকা থেকে জয় শ্রীরাম ঘণ্টা রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠায়

ভক্তদের প্রাণঢালা উপহার ◻ দুর্গাপদ ঘোষ ◻ ৪৩

শাজাহানকে ধরতে কেন এত নাটক? ◻ বিশ্বপ্রিয় দাস ◻ ৪৬

জ্ঞানবাপী পুনরুদ্ধারে নন্দী মহারাজের প্রতীক্ষার পরিসমাপ্তি
◻ অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায় ◻ ৪৮

নিয়মিত বিভাগ :

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২১-২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৭-৩০ ◻ অঙ্গনা : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৫০

ফঃ ১

প্রকাশিত হবে ১৮ মার্চ, ২০২৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১৮ মার্চ, ২০২৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

গণতন্ত্রে নাগরিক কর্তব্য

অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের ডঙ্কা বাজলো। ভারতকে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে বসানোর রায় জনগণ দিতে চলেছেন ২৪-এর নির্বাচনে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশে এই নির্বাচন। সমগ্র মানবজাতির নজর এই দেশ এবং নির্বাচনকে ঘিরে। ব্যস্ততা সকলের। একজন তন্বিষ্ঠ-ভোটার হিসেবে, সাধারণ মানুষ ও সকলের দায়িত্ব রয়ে যায় উপযুক্ত ও রাষ্ট্রবাদী প্রার্থীকে নির্বাচিত করে সংসদে পাঠানো, দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো বজায় রাখার লক্ষ্যে নির্ভরযোগ্য দলের হাতে দেশের শাসনভার ন্যস্ত করা। সেই প্রেক্ষাপটেই স্বস্তিকার আগামী সংখ্যা। দেশের সাম্প্রতিক উন্নয়নের বিবিধ বিষয়ে আলোকপাত করবেন এই সময়ের কয়েকজন লেখক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

কাশীধাম ও শিব মাহাত্ম্য

কাশীধাম বিশ্বেশ্বরের বৃহৎ আসন। সেই সূত্রেই নিখিল বিশ্বের সহিত তাহার আবহমানকালের সম্পর্ক। এই স্থানের মৃত্তিকাকণায়, পবিত্র বারিরাশিতে, উন্মুক্ত গগনসম্পদে দেশগত বন্ধন অতিক্রান্ত হইয়া বিরাজমান হইয়াছে বিশ্বজনীন এক পরম সত্তা। সেই সত্তায়, সেই আসনে, সেই স্থান-মাহাত্ম্যে ধরিত্রীর দেশগত বন্ধন লুপ্ত। কাশীতে তাই অসীমের স্পর্শ, অনন্তের অনুভূতি। ইহার অভ্যন্তরেই প্রকৃত ভারতবর্ষের জীবনস্রোত। ইহার পরতে পরতে ঐশী জীবনচর্যা ও মানসচর্চার শাশ্বত তরঙ্গ। ইহার বিশুদ্ধ সুর হইতে মৃত্যুর মুক্তিবাণী একদিন উত্থিত হইয়া মানবজাতির কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে। বিশ্বকবির তাই মনে হইয়াছিল, আমিও যেন তীর্থক্ষেত্রে মরিতে পারি; শেষ মুহূর্তে বলিতে পারি সকল দেশই আমার এই দেশ, সর্বত্রই এক বিশ্বেশ্বরের মন্দির। বলিতে পারি, সকল দেশের মধ্য দিয়াই মানবপ্রাণের পবিত্র জাহ্নবীধারা এক মহাসমুদ্রের অভিমুখে নিত্যকাল ধরিয়া প্রবাহিত। ...কিন্তু কাশীর এই পরম সম্পদ লুটিল কে? ভগবান বিশ্বনাথের বিশ্বদরবার ছারখার করিয়া ভাঙ্গিল কোন আসুরিক শক্তি? কোন সে 'রিলিজিয়ন' উদ্ধত-অস্ত্রের আঘাতে ধর্ম-সংস্কৃতির মণিমাণিক্য লুঠিতে চাহে? কোন দুর্বৃত্তের শাসনে ইতিহাস বাকহারা হইয়া পড়ে? আজ সেই নির্বাক-বধির ইতিহাসের কথকতা সর্বসমক্ষে কহিবার পালা! মহামান্য আদালতের নির্দেশে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের সার্বিক তত্ত্বাবধানে কাশী তথা বারাণসীর বিতর্কিত জ্ঞানবাপী মসজিদের কূপের অভ্যন্তর হইতে শিবলিঙ্গ পুনরাবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই সঙ্গে জাগ্রত হইয়াছে হিন্দুজাতির স্বাভিমান, হিন্দু অস্মিতা। তাই কহিতে হইবে—

'বিস্মৃত যত নীরব কাহিনি / স্তম্ভিত হয়ে বও।
ভাষা দাও তারে হে মুনি অতীত, / কথা কও, কথা কও।'

বহুদিন ধরিয়াই ভগবান শিব সম্পর্কে নঞর্থক ন্যারেটিভ তৈরির সূক্ষ্ম মানসিকতা লইয়াছে বামপন্থী, সেক্যুলার বুদ্ধিজীবী মহল। তাহারা শিবকে নিজস্ব ব্যাখ্যায় শনাক্তকরণ করিয়াছে, দেখাইবার চেষ্টা করিতেছে গাঁজাখোর, সিদ্ধি-ভাঙ নেশার হিন্দু দেবতা রূপে। সমগ্র বিশ্বের বামপন্থী বিজ্ঞানীদের কনসার্ট 'গঞ্জিকা' নামক একটি উপকারী ভারতীয় ভেষজ উদ্ভিদকে তালিকাভুক্ত ড্রাগ হিসাবে দাগাইয়া দিয়াছে। অথচ 'বাম-স্পেক্ট্রাম' গঞ্জিকা ইস্যুতে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরিয়া গিয়াছে। গঞ্জিকার রসদ প্রার্থনায় ফ্রাস্ট্রেটেড বামদিগের দক্ষিণহস্ত প্রসারণ করিতে হয় এক চিরন্তন ভস্মাবৃত অবয়বের দক্ষিণাবর্তে। বামপন্থী ছাত্রযুবদিগের বিকৃত জীবনযাত্রার বিকলাঙ্গ-হতাশ-নৈরাশ্যময় জীবনে কলিকার অগ্নিশিখা জ্বলিয়াছে ছুঁড়িয়া দেওয়া গঞ্জিকার উচ্ছিষ্টে। সিন্থেটিক ড্রাগের কুপ্রভাবের বিপ্রতীপে *হিবিসকাস ক্যানাবিস*-এর মতো উদ্ভিদকে এক পঙ্‌ক্তিতে ফেলিয়া, নিন্দা করিয়া তাহারা প্রকৃতপক্ষে ভারতের শৈবসাধনা ও আধ্যাত্মিক জগৎকে কলুষিত করিতে চাহে। ইহার পশ্চাতে যত না বিজ্ঞান, তাহার চাইতেও অধিক বামপন্থী, সেক্যুলার বিজ্ঞানীর রাজনৈতিক অভিপ্রায়। রহিয়াছে হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে একটি বৃহত্তর আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। কতিপয় ভারতীয় বায়োকেমিস্টদের ধূর্ততা এইবার ধরিয়া ফেলিবার পালা। গঞ্জিকা সেবনের মাহাত্ম্য এখানে প্রচারিত হইতেছে না। বিশ্বব্যাপী প্রকৃত গবেষণা প্রকল্প গৃহীত হউক, ডিপ্রেশনের অধুনা বিশ্বে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী, সুলভ ঔষধ তৈরি হউক।

শিবের যে দারিদ্র্য, তা প্রকৃতপক্ষে বৈরাগ্যের নামান্তর। তাঁহার স্ত্রী স্বয়ং অন্নপূর্ণা, অন্নদাত্রী; অথচ তিনি 'ভিখারি'। এ এক অভূতপূর্ব বৈপরীত্য! প্রবল প্যারাডক্স, ব্যঞ্জনাধর্মী ব্যাখ্যান! ধন নাই, তাহা বৃহৎ ব্যাপার নহে; ধন মহাদেবের প্রয়োজনও নাই। দারিদ্র্যের মধ্যে তো তাঁহার অতৃপ্তি নাই! তাহা বোঝাইবার জন্য তিনি শ্মশানচারী! যিনি সিদ্ধিতে নিপুণ, তাঁহার পার্থিব ধন-সম্পদের প্রয়োজন কী? অন্নের বেদিতে শুইয়া থাকিতে পারে বৈরাগ্যই; যিনি ত্রিগুণাতীত। তাহা বোঝাইতেই তিনি শ্মশানবাসী। সেই শিবকে কৃষিকাজ করিবার পরামর্শ দিতেছেন ভক্ত, ভগবানের দুঃখে ভক্তের অশ্রুজল। ইহাই যথার্থ ঈশ্বর প্রেম। কিন্তু বঙ্গপ্রদেশে ভগবান শিবকে কেবল বৃহৎ-উদর, সম্প্রদানকৃত তিন কন্যার গ্রহীতা, অলস-মেজাজ-কৃষিদেবতা করিয়া রাখিলে সেক্যুলারদের বিশেষ সুবিধা। যেমন সুবিধা হইয়াছে ভগবান কৃষ্ণকে অবিরাম কেচ্ছাকালিতে চুবাইয়া গল্প লিখিয়া। ভগবান শিবের রুদ্ররূপের তাৎপর্য এখন বুঝাইয়া দিবার এবং হিন্দুদিগের মনে জারিত করিয়া দিবার প্রয়োজন। রুদ্রপন্থী হইয়া উপযুক্ত কলম ধরিবার প্রয়োজন। সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য, সত্যান্বেষণে সহায়তার জন্য মগজাস্ত্রে শান দিবার ইহাই সময়। ভগবান শিবকে শ্রদ্ধা জানাইবার এমত পুষ্প এই মুহূর্তে আর নাই। 'কহ কহ দিগবাস / পূজার অর্ঘ্যে চাপা পড়া যত বেদনার ইতিহাস।'

সুভাষিতম্

পরিবর্তিনি সংসারে মৃতঃ কো বা ন জায়তে।
স জাতো যেন জাতেন যাতি বংশঃ সমুন্নতিম্।। (ভর্তৃহরি নীতিশতক)

এই পরিবর্তনশীল সংসারে কে এমন আছে যে কখনও মৃত হন না? সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বেঁচে থাকেন যার বংশ উন্নতি ও প্রসিদ্ধলাভ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের মর্যাদা কাদা মাটিতে মিশিয়ে মমতা

মাটি কাটি দংশে সর্প

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

লোকসভা ভোটে রাজ্যের প্রধান বিরোধী শক্তি বিজেপির প্রথম প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। ঘরোয়া ঝগড়ায় মত্ত শাসক তৃণমূল পিছিয়ে পড়েছে। বাকি দুই অপ্রাসঙ্গিক শক্তি বিদেশি বামপন্থী আর কংগ্রেসের আসন সমঝোতা হওয়ার আগেই হয়তো ২০২৪-এর ভোট শেষ হয়ে যাবে। তারা বরং ২০২৯-এর প্রস্তুতি নিক। তালিকায় নাম রয়েছে বলে সকলেরই হয়তো দাবি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে দেখে তাদের ভোট দিতে। এমন যদি চিন্তা হয় তবে তা রাজনৈতিক স্বাস্থ্যসম্মত নয়। মোদীজী রাজ্যে ৪২টি আসন জয়ের লক্ষ্য দিয়েছেন। লোকবিশ্বাস ও ভরসা তিনিই সমস্ত আসনে প্রার্থী, রাজ্যের সেই ভোট মনস্তত্ত্ব পরিষ্কার।

তালিকায় থাকা প্রার্থীরা যদি ভেবে থাকেন মোদীকে দেখিয়েই তারা হাত-পা ছেড়ে বসে থাকবেন তাহলে রাজনৈতিকভাবে তা ভুল হবে। কারণ তাতে নিজেদের পাশাপাশি দলকেও ছোটো করা হয়। বিজেপি যখন তৈরি হয়, মোদীর তখন মাত্র তিরিশ বছর বয়স। এখন তিনি ৭৫। তাঁর পঁয়তাল্লিশ বছরের দীর্ঘ লড়াই জুড়ে রয়েছে সঙ্ঘের কার্যকর্তা আর প্রচারক, বিজেপি-র কার্যকর্তা আর মুখ্যমন্ত্রিত্ব। তাই তাঁকে আলাদা করে দেখালে কেউ হয়তো তাঁকে ইন্দিরা গান্ধী বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তুলনা করে ফেলতে পারেন যা একেবারেই কাম্য নয়। মমতা বলেছিলেন ৪২-এ ৪২।

সব আসনে তিনি প্রার্থী। আর কংগ্রেস নেতা দেবকান্ত বড়ুয়া দাবি করেছিলেন 'ইন্দিরা ইজ ইন্ডিয়া'। মমতা আটকে ছিলেন ২২ আসন পেয়ে আর ১৯৮৪-তে ইন্দিরা হত্যার পর ১৯৮৫ থেকে কংগ্রেস প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এককভাবে আর কোনোদিন দেশ চালাতে পারেনি। এটা মনে রাখা দরকার রাজনৈতিক অবিবেচকরা ইতিহাসে স্থান পায়না। একটু অন্য বিষয়ে আসি। কথায় বলে, 'কয়েন না কর্তা ঘোড়ায় হাসব'। সন্দেশখালির ধরে রাখা দুষ্কৃতী শাজাহান শেখকে নাকি পুনরায় গ্রেফতার করেছে রাজ্যের পুলিশ। এটা যদি মিথ্যা হয় তাহলে রাজ্যকেই বলতে হবে কীভাবে তা মিথ্যা। সে উত্তর পুলিশ দেয়নি। কোনোদিন দিতে পারবে বলে মনে হয় না। কারণটা রাজনৈতিক। পুলিশের নাগালের বাইরে। পরে কোনো অফিসার এটা নিয়ে বই লিখতে পারেন। তখন হয়তো রাজ্যের প্রধান দুই শাসক মমতা আর ভাইপো অভিষেক ক্ষমতার অলিন্দে থাকবেন না। আর থাকলেও হয়তো এমনভাবে থাকবেন যাতে তারা কোনো বাধা সৃষ্টিকারী হবেন না।

পুলিশের সর্বোচ্চ কর্তা দু'দিন ধরে ভেড়ি তোলপাড় করে শেখকে খুঁজে পায়নি। গৃহস্থ রান্নাঘরের থেকেও ছোটো একটি থানা তাকে খুঁজে গ্রেফতার করেছে। তার বিরুদ্ধে পনেরোটি অভিযোগ দেওয়া হয়েছে, কেবল নারী নিগ্রহ নেই। অথচ ওটাই নাকি প্রধান অভিযোগ। পুলিশ জানিয়েছে গ্রেফতারি নিয়ে তদন্ত চলছে। তেইশ বছর আগেই শেখের গারদের পিছনে থাকার কথা ছিল। মোদী জানিয়েছেন তৃণমূল রাজ্যকে লুট আর দুর্নীতির বঙ্গে পরিণত করেছে। দাবিটা রাজনৈতিক বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। কারণ রাজ্যের জনগণের জন্য পাঠানো বহু কেন্দ্রীয় সহায়তা— রাজ্যের শাসক দল আর তাদের নেতাদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার হয়েছে। বড়ো প্রমাণ মমতা কোনো হিসাব দিতে চান না। কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের দাবি নতুন নয়। তা সঙ্গত হলেও কোনোভাবেই তা নিয়ম বিরুদ্ধ হতে পারে না। আর রাজ্য প্রশাসন ঠিক সেই কাজটাই করছে। দুষ্কৃতী শাজাহানের গ্রেফতারির বিষয়ে বেনিয়মটা যেমন সত্য, একইরকমভাবে কেন্দ্রের পাঠানো অর্থের সময়মতো হিসাব না দেওয়াটাও মিথ্যা নয় বলেই ধারণা হয়।

> **দুষ্কৃতী শাজাহানের গ্রেফতারির বিষয়ে বেনিয়মটা যেমন সত্য, একইরকমভাবে কেন্দ্রের পাঠানো অর্থের সময়মতো হিসাব না দেওয়াটাও মিথ্যা নয় বলেই ধারণা হয়।**

অনেকেই দাবি করছেন মমতার রাজনৈতিক আয়ু শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছে। মনে হয় এই ধরনের চটজলদি ধারণা স্বাস্থ্যকর রাজনৈতিক চিন্তার পরিপন্থী। ১৯৯৮-এ দল তৈরি করার পর মমতা ভাবতেন ২০০১ বা ২০০৬-এ বিদেশি বামেদের উৎখাত করবেন। তাকে তেরো বছর অপেক্ষা করতে হয়। তবে এ ব্যাপারে বিজেপি অনেকটাই এগিয়ে। মমতার পাপের ঘর এতটাই বড়ো যে সামাল দেওয়া অসম্ভব। তাতে বিজেপির কোপ বসানো কেবল সময়ের অপেক্ষা। মমতা বুঝতে পারছেন না রাজ্যের মর্যাদা— অমর্যাদায় পরিণত হয়ে যে কাদা মাটিতে মিশেছে সেখানে সাপের জন্ম হয়েছে। রাজনৈতিক আয়ু ফুরিয়ে যাওয়া মমতা তাকে আটকাতে পারবেন না। এটাই তার ভবিতব্য। □

মার সাংবাদিক মার

সমালোচনা বিরোধেষু দিদি,

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি রাজ্যে এসে বারবার সন্দেশখালির মা, বোনেদের কথা বলছেন। গোটা দেশ দেখেছে কীভাবে নির্যাতন করা যায়। কীভাবে অভিযুক্তদের আড়াল করা যায়। আর দেখেছে কীভাবে রাজ্যের প্রধান মুখ্যমন্ত্রী নীরব হলেও কাজে দেখিয়ে দিয়েছেন।

সন্দেশখালিতে কর্মরত সাংবাদিককে গ্রেপ্তারের ঘটনায় এ রাজ্যে সাংবাদিক-হেনস্থার নতুন নজির স্থাপন করেছেন আপনি। সংবাদ চ্যানেলের ওই সাংবাদিক সঙ্গে সঙ্গেই জামিন পেয়েছেন। আর কলকাতা হাইকোর্ট সরকারকে ভর্ৎসনাও করেছে। আবার, একটি সংবাদ চ্যানেলের শীর্ষ সাংবাদিকের বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ জারি করে কলকাতা হাইকোর্ট রাজ্য পুলিশকে ভর্ৎসনা করেছে। সংবাদমাধ্যমকে স্বাধীনতার সঙ্গে এবং নির্ভয়ে কাজ করতে দেওয়ার গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। দুর্নীতিতে অভিযুক্তদের দিকে মন না দিয়ে সাংবাদিককে গ্রেপ্তারে কেন মনঃসংযোগ, তৃণমূল সরকারের প্রতি আদালতের এই প্রশ্ন বস্তুত রাজ্যবাসীরই মনের প্রশ্ন। তবে এই ঘটনাকে আকস্মিক বলা চলে না। কোনও সংবাদ প্রতিবেদন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে গেলে আচমকা গ্রেপ্তার হতে পারেন সাংবাদিক, এমন ঘটনা এই রাজ্যে সম্প্রতিকালে অনেক বার ঘটতে দেখা গিয়েছে। ইউটিউবারদের জেল যাত্রা এ রাজ্যে নতুন নয়।

গত বছর সেপ্টেম্বরে একটি বাংলা দৈনিকের সাংবাদিক এমনই অকস্মাৎ গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তাঁর কী অবরাধ ছিল? কয়েকটি রিপোর্ট পশ্চিম মেদিনীপুরের অবৈধ মদের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণে পুলিশের ব্যর্থতা ও নিষ্ক্রিয়তা প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। প্রতিবেদন প্রকাশের ন'দিনের মাথায় গভীর রাতে পুলিশ তাঁর বাড়িতে হানা দিয়ে ওই সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করে। মনে হয়েছিলে কোনও সন্ত্রাসবাদীকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। তিনিও জামিনে ছাড়া পেয়েছেন। কারও বিরুদ্ধে গুরুতর কোনও অভিযোগ থাকলে অবশ্যই তার যথাযথ তদন্ত প্রয়োজন। কিন্তু সাংবাদিককে কিছুমাত্র জিজ্ঞাসাবাদ না করে, আত্মপক্ষ সমর্থন কিংবা আইনি পরামর্শ নেওয়ার কোনও সুযোগ না দিয়ে, মাঝ রাতে গ্রেপ্তার এবং হাজতবাস করানোর আসল উদ্দেশ্য তো তার মুখ বন্ধ করা। গণতন্ত্রে সেটা কি করা যায়?

এক এক সময়ে মনে হয় রাজ্যে জরুরি অবস্থা চলছে। আসলে বাংলার সরকার আর তৃণমূল এক হয়ে গিয়েছে। শাসক দলের প্রতিকূল সংবাদ প্রকাশ হলেই সেটা রাজ্যের বিরুদ্ধে হয়ে যায়। আর তার জন্য সাংবাদিককে মামলায় জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা। গত বছর জানুয়ারিতে নবদ্বীপে আটজন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে এফআইআর করেছিল পুলিশ। তাঁরা সকলেই নবদ্বীপ পুরসভার দুর্নীতির বিষয়ে খবর করেছিলেন। নেতার মানহানি, রাজ্যের ভাবমূর্তিতে আঘাত, ভুয়ো খবর ছড়ানো থেকে শুরু করে মেয়েদের শ্লীলতাহানি, নানা অভিযোগ আরোপ করা হচ্ছে সাংবাদিকের উপরে। মামলা করার আগে বা গ্রেপ্তারের আগে পুলিশ সেই ঘটনার প্রাথমিক তদন্তটুকুও করেনি। দিদি, এ কি আইনের শাসন?

দিদি, বাম জমানায় সরকারের ত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে আপনার আন্দোলনকে সমর্থন করে সংবাদমাধ্যমই আপনার ক্ষমতায় বসার পথ মসৃণ করে দিয়েছিল।

আইনের বেআইনি প্রয়োগেও কুণ্ঠা দেখা যায়নি সন্দেশখালিতে। ইডির তদন্ত দলের সঙ্গী সাংবাদিকরা তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের অনুগামীদের হাতে মার খেয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তার পরেও সন্দেশখালিতে গিয়েছেন সাংবাদিকরা, সেখানকার নৈরাজ্যের ছবি সামনে এনেছেন। কারণ, সেটাই তাঁদের কাজ।

পেশাগত কারণে মানুষকে সঠিক ছবি দেখাতে সাংবাদিকরা চিরকাল ব্যক্তিগত ঝুঁকি নিয়েই কাজ করতে যান। সংবাদের স্বাধীনতার প্রতি অসহিষ্ণু, সাংবাদিক-নিপীড়নে দ্বিধাহীন, প্রশাসনিক স্বচ্ছতায় অনাগ্রহী, বিভ্রান্তিকর পরিসংখ্যান প্রচারে পারদর্শী হয়ে উঠেছে বাংলার পুলিশ।

দিদি, এর জন্য কি আপনি দায়ি নন? নানা সময়ে সাংবাদিকের প্রশ্নে উষ্মা প্রকাশ করে সেই সাংবাদিককে 'বিরোধী' বলে দাগিয়ে দিয়েছেন, অপছন্দের সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করেছেন। পাশাপাশি, কিছু সাংবাদিককে নিয়ে নিজের চার পাশে একটি বৃত্ত তৈরি করেছেন। তাঁরা আপনার কথায় ওঠেন, বসেন বলে আপনি তাঁদের রক্ষাকর্ত্রী।

সামনে ভোট। সাংবাদিকরা নিজেদের কাজ করবেন। কিন্তু সবাই জানে সংবাদমাধ্যমের মালিকপক্ষকেও ভয় দেখিয়ে বা তুষ্ট করে আপনি নিজের করে রেখেছেন। ফলে নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আর নেই বাংলা। এখন দেখার ভোটের সময়ে কত সাংবাদিক শাসকদলের রোষে মুখে পড়েন। কিন্তু মনে রাখবেন দিদি, বাম জমানায় সরকারের ত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে আপনার আন্দোলনকে সমর্থন করে সংবাদমাধ্যমই আপনার ক্ষমতায় বসার পথ মসৃণ করে দিয়েছিল। □

অতিথি কলম

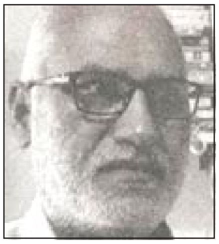

অনিল তিওয়ারী

প্রতিটি ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পাচ্ছে দেশীয় শক্তি

অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বদেশী উৎপাদন ও আত্মনির্ভরতার মন্ত্র হলো সেই চাবিকাঠি যা বিশ্বমঞ্চে অর্থনৈতিক ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রসমূহে একটি প্রভাবশালী শক্তিতে পরিণত করতে সক্ষম।

আত্মনির্ভর দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে সংকল্প গ্রহণ করে সেই পথে ধাবমান ভারত তার প্রতিটি ক্ষেত্রে ‘স্বদেশী’ বা দেশজ উৎপাদন ও পরিষেবার. ধ্বজকে উড্ডীন করেছে। দেশে ব্যবহৃত ৯৯ শতাংশ মোবাইল ফোনের উৎপাদন এখন ভারতেই হচ্ছে। তার সঙ্গে রণতরী ও লাইট এয়ারক্র্যাফট্ (হাল্কা যুদ্ধবিমান) থেকে শুরু করে ঘাতক (লক্ষ্যবস্তুতে আঘাতে সক্ষম) ড্রোন পর্যন্ত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পণ্য ও সামগ্রী উৎপাদনরত ভারত তার সামর্থ্যের পরিচয় তুলে ধরে সমগ্র বিশ্বে এই দেশীয় শক্তির পরিচয়বাহী বার্তাটি প্রেরণে সক্ষম হয়েছে। দেশীয় প্রযুক্তির শক্তিতে ভর করে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করে বিশ্বে চমক সৃষ্টি ছাড়াও প্রতিরক্ষা উৎপাদন (ডিফেন্স ম্যানুফ্যাকচারিং)-এর আর্থিক পরিমাণ ২৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে আগের ৬৮৬ কোটি থেকে ২০২২-’২৩ আর্থিক বছরে ১৬ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাওয়ার মতো সাফল্য অর্জন করেছে।

কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন এনডিএ সরকারের নেতৃত্বে ভারতে উৎপন্ন ও গবেষণালব্ধ দেশীয় অস্ত্র, উপকরণ ও প্রযুক্তির সাহায্যে প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হয়ে ওঠার লক্ষ্যে দ্রুতলয়ে এগিয়ে চলেছে। স্বাবলম্বী ভারত অভিযান দ্বারা ‘স্বদেশী’ অর্থাৎ দেশীয় পণ্য ও পরিষেবা উন্নয়নে অগ্রাধিকারদানের কারণে ভারতীয় অস্ত্র, মিসাইল, হাল্কা ফাইটার জেট (যুদ্ধবিমান) ও ড্রোন সিস্টেম সম্পর্কে পৃথিবী জুড়ে আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে। আজ বিশ্বের ৮৫টি দেশে ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্র, প্রতিরক্ষা উপকরণ ও তার যন্ত্রাংশ রপ্তানিকারক দেশ হয়ে উঠেছে ভারত। ‘আত্মনির্ভর ভারত’-এর কেন্দ্রীয় নীতি ও ‘স্বাবলম্বী ভারত অভিযান’-এর ফলে ভারতের তরফে অস্ত্র আমদানির খরচেও লাগাম পরানো সম্ভব হয়েছে। ২০১৮-’১৯ আর্থিক বছরে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে হওয়া খরচ অর্থাৎ প্রতিরক্ষা ব্যয়ের ৪৬ শতাংশ অস্ত্র ও ডিফেন্স সিস্টেম ক্রয়ে খরচ হয়। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে এই ব্যয় হ্রাস প্রাপ্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে মোট ব্যয়ের ৩৫.৬ শতাংশ।

চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের মতো চমকপ্রদ ঘটনার মাধ্যমে বিশ্বময় আলোড়ন সৃষ্টি করেছে ভারত। পুরোপুরি দেশীয় উপকরণসমূহে সমৃদ্ধ, সজ্জিত ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর তরফে প্রস্তুত এই চন্দ্রযান-৩-এর সফল উৎক্ষেপণের পরেই চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণকারী দেশ হিসেবে পৃথিবীর প্রথম দেশে পরিণত হয় ভারত। একইভাবে, সূর্য সংক্রান্ত অধ্যয়ন ও গবেষণার লক্ষ্যে ইসরোর তরফে প্রস্তুত আদিত্য এল-১-এর উৎক্ষেপণও সফল হয়েছে। সূর্য বিষয়ক তথ্য অন্বেষণে এটি ভারতের প্রথম মহাকাশ অভিযান। সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী ল্যাগরেঞ্জ পয়েন্ট ওয়ান বা এল-১ নামক একটি বিশেষ বিন্দুতে আদিত্য এল-১ স্থাপিত হবে এবং সূর্যের যাবতীয় গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করবে। সূর্য সংক্রান্ত গবেষণার লক্ষ্যে এই মহাকাশযান ১৫ লক্ষ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেবে।

দেশীয় উপকরণ ও প্রযুক্তি উন্নয়নের দরুন মহাকাশ গবেষণা ও অনুসন্ধানের লক্ষ্যে বিশ্বের মধ্যে দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে ভারত। ২০৪০ সালের মধ্যে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংক্রান্ত বাজারের আর্থিক পরিমাণ ৪ হাজার কোটি থেকে ১০ হাজার কোটি ডলার অতিক্রমের সম্ভাবনা প্রবল। আর্থার ডি. লিটল্ নামক আমেরিকা-স্থিত একটি আন্তর্জাতিক স্তরের ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি বা কনসালটিং ফার্মের তরফে উপরোক্ত দাবিটি জানানো হয়েছে। ইসরোর সঙ্গে চারটি দেশ ৬টি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। আন্তঃরাষ্ট্রীয় মহাকাশ মিশনসমূহ বাস্তবায়নের কারণে ভারতের ১৪.০১ কোটি ডলার আয় করবে ভারত। মহাকাশ গবেষণা ও অনুসন্ধানের সঙ্গে যুক্ত ১০০টিরও বেশি স্টার্ট-আপ কোম্পানি আজ ভারতে ক্রিয়াশীল। ২০৩০ সালের মধ্যে মহাকাশ সম্পর্কিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ভারতীয় অংশীদারীত্ব বেড়ে ১০ শতাংশ হবে বলে অনুমান। ২০৩০ সালের মধ্যেই মহাকাশে ভারত নিজস্ব স্পেস

স্টেশন নির্মাণেও সমর্থ হবে।

আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের অধীনে ভারত সরকার ২০২৪-'২৫ আর্থিক বছরের মধ্যে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার কোটি টাকা মূল্যের প্রতিরক্ষা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে। একই সঙ্গে এই সময়কালে প্রতিরক্ষা সামগ্রীর রপ্তানি বৃদ্ধি ঘটিয়ে ৩৫ হাজার কোটি টাকা অতিক্রমের লক্ষ্য স্থির হয়েছে। ২০২০ সালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ১০১টি প্রতিরক্ষা পণ্যসামগ্রী আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এইসব প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত উপকরণসমূহের উৎপাদন এখন ভারতে হচ্ছে। বর্তমানে ভারতে ৩৭০০টি প্রতিরক্ষা সামগ্রী উৎপাদিত হচ্ছে। ২০২৪ সালে দেশীয় প্রযুক্তি-নির্ভর আরও ৩৫১টি পণ্যের উৎপাদন ভারতে শুরু হতে চলেছে। নাসা-ইসরোর যৌথ অংশীদারীত্বে প্রস্তুত নিসার উপগ্রহ (স্যাটেলাইট) থেকে সমুদ্র স্তর, ভূগর্ভস্থ জল, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দুর্যোগ, ভূমিকম্প, সুনামি, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত এবং প্রতি মুহূর্তে পৃথিবী জুড়ে সংঘটিত প্রতিটি পরিবর্তনের তথ্য ইসরো সংগ্রহ করবে। ২০২৪ সালের শেষের দিকে এই স্যাটেলাইট মিশনটিকে কার্যকর করা হবে। ২০২৪ সালেই ইসরো গগনযান নামক ম্যানড্ মিশন মহাকাশে প্রেরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই মিশন লঞ্চের আগে 'ব্যোমমিত্র' নামক যন্ত্রমানবী বা রোবটকে মহাকাশে প্রেরণের যোজনাও গৃহীত হয়েছে। গগনযান মিশনের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ভারতীয় বায়ুসেনার ৪ জন পাইলট ইতিমধ্যেই নির্বাচিত হয়েছেন। এই বছরেরই ফেব্রুয়ারি মাসে বায়ুসেনার হাতে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত তেজস এমকে-১৭ ফাইটার জেট আসারও সম্ভাবনা। মোট ৮৩টি তেজস ফাইটার জেট যুদ্ধবিমান বায়ুসেনার হাতে আসবে। এই ব্যাপারে হ্যালের সঙ্গে ৪৮ হাজার কোটি টাকার চুক্তিও চূড়ান্ত হয়েছে।

৫জি চালু হওয়ার পর ভারতে ৬জি ইন্টারনেট পরিষেবা রূপায়ণের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। ইন্ডিয়ান মোবাইল কংগ্রেসে বক্তব্য রাখাকালীন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে আগামী দিনের ৬জি ক্ষেত্রের নেতৃত্বদানের উদ্দেশ্যে ভারত প্রয়াসী হয়েছে। স্বাবলম্বী ভারত অভিযানের প্রধান কার্যকর্তাদের চিন্তাধারা অনুযায়ী ভারতের মতো একটি বৃহৎ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও বিপুল জনসংখ্যার অধিকারী দেশকে একটি স্বনির্ভর দেশে পরিণত করা ব্যতীত অন্য কোনো বিকল্পও অনুপস্থিত। ভারতে যারা বিভিন্ন পণ্য সরবরাহ করে থাকেন, ভারতের প্রয়োজন ও বিপুল চাহিদা মেটানোর নিরিখে সেই যোগান প্রকৃতপক্ষে অপ্রতুল। তাই বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ হওয়া ছাড়া অন্য রাস্তা ভারতের সামনে খোলা ছিল না, এখনও নেই।

নানা প্রয়োজনে অন্য দেশগুলির প্রতি নির্ভরশীলতার দরুন ভারতকে তার মূল্য দিতে হয় এবং এহেন বিষয়টি বর্তমান সময়কালে রাষ্ট্রহিতের পরিপন্থী। প্রতিরক্ষা, খাদ্যশস্য, কম্পিউটার, মোবাইল, গৃহস্থালীর নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বা অটোমোবাইল— প্রতিটি পণ্য উৎপাদনে ভারতের আত্মনির্ভরতার বিশেষ প্রয়োজন। এখনও পর্যন্ত ভারত যে ক্ষেত্রটিতে সর্বাধিক স্বনির্ভরতা অর্জন করেছে সেটি হলো 'অ্যাসেম্বলিং'। প্রকৃত আত্মনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে ভারতকে কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য চীন ও অন্যান্য দেশের প্রতি নির্ভরতা মুক্ত হতে হবে। স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের অখিল ভারতীয় সহ-সংযোজক অধ্যাপক অশ্বিনী মহাজন মনে করেন যে এই আত্মনির্ভরতা অর্জনের উদ্দেশ্যে বিগত কয়েক বছর ধরে নিরন্তর প্রয়াস জারি আছে এবং সম্প্রতি তার সুন্দর পরিণামও আসা শুরু হয়েছে। ভারতের বর্তমান ক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরের গবেষণায় এই মুহূর্তে গুরুত্ব আরোপ করা বিশেষ প্রয়োজন। এখন দেশ জুড়ে চলা বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পের বেশির ভাগ চলছে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানিগুলিতে। এই কারণে গবেষণা ক্ষেত্রে বেসরকারি ক্ষেত্রসমূহের অংশীদারীত্ব বৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন। এই বছর প্রতিরক্ষা মন্ত্রক বিভিন্ন প্রতিরক্ষা সামগ্রীর একটি তালিকা প্রকাশ করেছে ভবিষ্যতে যেগুলির উৎপাদন ভারতেই সম্ভবপর হবে। এইভাবে পর্যায়ক্রমে এই পণ্যগুলির আমদানির ওপরে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হওয়াও বাঞ্ছনীয়। প্রতিরক্ষা সামগ্রী সমূহের নানা যন্ত্রাংশও এখন ভারতে উৎপাদিত হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় বহু কোটি টাকার সাশ্রয়ও হচ্ছে। অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বদেশী উৎপাদন ও আত্মনির্ভরতার মন্ত্র হলো সেই চাবিকাঠি যা বিশ্বমঞ্চে অর্থনৈতিক ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রসমূহে একটি প্রভাবশালী শক্তিতে পরিণত করতে সক্ষম।

ভারতীয় নাগরিকদের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে দেশে ১,৬০,৪৮০টি হেলথ্ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার পরিচালনার বিষয়টিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ২০২০ সালে শিক্ষাগত ক্ষেত্র সম্পর্কিত অর্থনীতির বাজার ছিল ১৮ হাজার কোটি ডলার, ২০৩০ সালে যা ৩২ হাজার কোটি ডলারে পৌঁছতে চলেছে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্পের অধীনে ৩৪টি বন্দে ভারত ট্রেনের যাত্রা চালু রয়েছে। কেন্দ্রীয় যোজনা অনুসারে ২০২৪ সালে এই ট্রেনগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৭৫টিতে পৌঁছবে।

দেশীয় প্রযুক্তি ও ভারতীয় যুব সম্প্রদায়ের মেধাশক্তির ভিত্তিতে ভারত প্রতিদিন উন্নতির নতুন সোপান রচনা করে চলেছে। আগামী বছরগুলিতে ভারত সাফল্যের নতুন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করবে সেই আশাপ্রকাশ স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত।

(লেখক স্বদেশী প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ)

শোক সংবাদ

গত ২ মার্চ সকাল ১০টা ৪৮ মিনিটে অমৃতলোকে যাত্রা করেন মালতী দাস। তিনি হুগলী জেলার দারহাট্টা গ্রামের আনন্দ মোহন দাসের মাতৃদেবী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭। তিনি রেখে গেলেন চার পুত্র, তিন কন্যা, পুত্রবধূ, জামাতা ও নাতি-নাতনিদের। আনন্দ মোহন দাস বর্তমানে হুগলী জেলার সহ-সঙ্ঘচালক এবং স্বস্তিকা পরিচালন সমিতির সদস্য।

চীনের পাকিস্তানগামী পারমাণবিক পণ্য-পরিবাহী জাহাজ আটক ভারতীয় বন্দরে

চীন থেকে একটি করাচিগামী জাহাজকে মুম্বইয়ের নভশেভা বন্দরে আটক করেছে এদেশের নিরাপত্তা সংস্থা। জাহাজটিকে ঘিরে রহস্য দানা বাঁধতেই ভারতের তরফে জাহাজের সামগ্রী খতিয়ে দেখা হয়। একইসঙ্গে জাহাজ ঘিরে পারমাণবিক অস্ত্র যোগের সন্দেহ করা হচ্ছে। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, জাহাজটিতে এমন কিছু সামগ্রী রয়েছে, যা পাকিস্তানের পারমাণবিক ও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রসঙ্গত, গোয়েন্দা সূত্র মারফত খবর পেয়ে ভারতের মুম্বইয়ে একটি বন্দরে গত ২৩ জানুয়ারি পাকিস্তানের করাচিগামী মাল্টার পতাকাবাহী জাহাজটিকে আটক করা হয়। সিএমএ সিজেএম আর্টিলা নামের ওই জাহাজ সেদিন যাচ্ছিল পাকিস্তানের করাচি বন্দরের দিকে। সেখানে যে চালান উদ্ধার হয়, তাতে উল্লেখ ছিল কম্পিউটার নিউমেরিকাল কন্ট্রোল (সিএনসি) মেশিনের তথ্য। এই মেশিন ঘিরে দানা বাঁধে রহস্য। জানা যাচ্ছে যে, মূলত ইতালির কোনো এক কোম্পানির তৈরি।

সিএনসি মেশিনগুলো মূলত একটি কম্পিউটারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। মেশিনটি দক্ষতা, ধারাবাহিকতা ও নির্ভুলতার এমন মাত্রা তৈরি করে যা হাতে করে (ম্যানুয়ালি) করা সম্ভব নয়। আসলে এই ধরনের মেশিন সামরিক কিংবা অসামরিক দুই কাজেই ব্যবহার হতে পারে। তবে ভারতের সন্দেহ যে, সামগ্রীটি পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে ব্যবহৃত হওয়ারই সম্ভাবনা। এদিকে, মুম্বইয়ের বন্দরে আটক হওয়া জাহাজের সামগ্রী সদ্য খতিয়ে দেখেছেন ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও)-এর সদস্যরা। তাঁদের মতে, পণ্যগুলো প্রতিবেশী দেশ

(পড়ুন পাকিস্তান) তার পারমাণবিক কর্মসূচিতে ব্যবহার করতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, পাকিস্তানের ক্ষেপণাস্ত্র উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য গুরুত্বপূর্ণ অংশ তৈরিতে এই সরঞ্জামগুলো কাজে লাগানোর সম্ভাবনা আছে।

১৯৯৬ সাল থেকে সিএনসি মেশিনগুলো পারমাণবিক-অস্ত্র ব্যবস্থায় ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা যায়। যেমন সিএনসি মেশিনটি উত্তর কোরিয়া তাদের পারমাণবিক কর্মসূচিতে ব্যবহার করেছিল। পণ্যের বিল ও চালানের অন্যান্য নথি অনুসারে, চালানটির প্রেরক হিসেবে 'সাংহাই জেএক্সই গ্লোবাল লজিস্টিকস কোং লিমিটেড'কে উল্লেখ করা হয়েছিল এবং প্রাপক ছিল শিয়ালকোটের 'পাকিস্তান উইংস প্রাইভেট লিমিটেড'। তবে ভারতীয় নিরাপত্তা সংস্থার তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২২ হাজার ১৮০ কেজি ওজনের দ্রব্যটি তাইওয়ান মাইনিং ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট কোম্পানি লিমিটেড থেকে পাঠানো হয়েছে। এর গন্তব্য ছিল পাকিস্তানের কসমস ইঞ্জিনিয়ারিং।

ভারতের বন্দরে এরকম দ্বৈত-ব্যবহারযোগ্য চালান আটক করার ঘটনা এবারই প্রথম নয়। এর আগেও চীন থেকে পাকিস্তানের উদ্দেশে আসা এরকম পণ্যের চালান আটক করা হয়েছে। ভারতীয় কর্মকর্তাদের দাবি, পাকিস্তান ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেস্ট্রিক্টেডে পণ্যগুলো কেনার জন্য বিকল্প উপায় হিসেবে চীনের কাছে যেতে পারে এমন উদ্বেগ রয়েছে। এদিকে, মুম্বইতে জাহাজ আটক হতেই ক্ষোভে ফুঁসছে পাকিস্তান। ঘটনাটিকে 'অযৌক্তিক' আখ্যা দিয়েছে ইসলামাবাদ। কড়া ভাষায় মুম্বইতে আটক পাক জাহাজের ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়েছে পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রক।

পাকিস্তানের তরফে জানানো হয়েছে, যে সামগ্রী ঘিরে সন্দেহ, তা সম্পূর্ণ সাধারণ একটি লেদ মেশিন, যা পাকিস্তানের বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার হওয়ার কথা ছিল। এই সামগ্রী পাকিস্তানের অটোমোবাইল সেক্টরের সঙ্গে যুক্ত বলেও দাবি করা হয়েছে। পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রকের এক সাংবাদিক বৈঠকে তাদের মুখপাত্র বলেন, 'এই ধরনের রিপোর্টগুলিতে প্রকাশ পায় ভারতীয় মিডিয়া এ-সংক্রান্ত তথ্যকে ভুলভাবে পেশ করছে। জাহাজে সম্পূর্ণভাবে বাণিজ্যিক ব্যবহারের সামগ্রী রয়েছে। এর লেন-দেন স্বচ্ছ ব্যাংকিং চ্যানেল মারফত হয়েছে। তার নথিও রয়েছে।'

ধরা পড়ে পাকিস্তান এখন সাফাই দিচ্ছে, যে এই ধরনের বাধা আগামীর জন্য ভালো নয়। এই ধরনের ঘটনা আন্তর্জাতিক নীতি লঙ্ঘনের একটি দিক, এটি আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনের স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থা নেওয়ার শামিল বলেও জানিয়েছে ইসলামাবাদ। কিন্তু পাকিস্তানের এই ছদ্ম-প্রতিবাদী চেহারার সামনেও ভারত যেভাবে দৃঢ়চেতা ভূমিকা নিয়েছে, তাতে দেশের নিরাপত্তায় তাদের আপোশহীন কূটনৈতিক অবস্থান আরও একবার প্রমাণিত হলো বলে মনে করা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে সৃষ্টি হওয়া ভয়ংকর আগ্নেয়গিরির একটি মুখের নাম সন্দেশখালি

সাধন কুমার পাল

মহাভারতের যুগের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা পিতামহ ভীষ্ম, শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর কর্ণ, অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য দুর্যোধনের সাম্রাজ্য রক্ষা করতে পারেননি। আজকের দিনেও রাজীব কুমার, মনোজ ভার্মার মতো ট্যালেন্টেড পুলিশ অফিসাররা মমতা ব্যানার্জীর সাম্রাজ্য রক্ষা করতে পারবেন না। ভারতবর্ষের ১০ জন পুলিশ অফিসারের নাম করলে তার মধ্যে রাজীব কুমার, মনোজ ভার্মারা অবশ্যই আসবেন। এরা ব্যক্তিগতভাবে অসৎ একথা এখনো কেউ বলেননি, তবে এরা অত্যন্ত উচ্চ মেধাসম্পন্ন, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এই বিষয়ে কোনও বিতর্ক নেই। ভীষ্ম, দ্রোণ বা কর্ণের প্রতিভা যেমন দুরাচারী দুর্যোধনের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য সমর্পিত ছিল তেমনি রাজীব কুমার, মনোজ ভার্মাদের মেধা প্রতিভাও দুরাচারী মমতার সাম্রাজ্য রক্ষা করে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা বৃদ্ধির জন্য সমর্পিত হয়েছে। বাম জমানাতেও এই ধরনের মেধাবী পুলিশ অফিসার, আমলারা বাম সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য সর্বস্ব সমর্পণ করেছিল। সেজন্যই মহাভারতের যুগের ভীষ্ম অথবা কর্ণের সঙ্গে এদের তুলনা টানা যেতে পারে।

আমার এই লেখা যদি এই পুলিশ অফিসারদের নজরে আসে তবে তাদের একবার ভেবে দেখতে বলব। আপনাদের অর্জিত সমস্ত অতুলনীয় ক্ষমতাকে আপনারা কি উদ্দেশ্যে কাজে লাগাচ্ছেন? সারদা কাণ্ডে হাজার হাজার মানুষের সঞ্চিত সামান্য সম্বলটুকু লুটেপুটে খাওয়ার মূলে যে মমতা ব্যানার্জী ও তার শাগরেদরা তাদেরকে বাঁচাতে সেই কেলেঙ্কারির সমস্ত তথ্য প্রমাণ নষ্ট করে দিয়ে অপরাধীদের বাঁচিয়ে দেওয়ার অভিযোগের আঙুল উঠেছে রাজীব কুমার আপনার দিকে। সেজন্যই সিবিআই-এর হাত থেকে আপনাকে বাঁচানোর জন্য মমতা ব্যানার্জী নিজে ধরনা দিয়েছিলেন। একজন আইপিএস অফিসার হয়ে আপনাকেও একজন সাধারণ অপরাধীর মতো দীর্ঘদিন আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছে। হ্যাঁ আপনার মস্তিষ্কের ক্ষমতার বলে বিচারের ফাঁস থেকে আপনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন এটা সত্য, কিন্তু মানুষের ঘৃণা কুড়িয়েছেন অনেক। আশা করি এটা অনুভব করার চেষ্টা করবেন। এখন আবার সেই আপনার সহজাত ক্ষমতা দিয়ে সন্দেশখালির

> **জেহাদিদের লালসার আগুনে সারা পশ্চিবঙ্গ আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হয়েছে। সন্দেশখালিতে সেই আগ্নেয়গিরির একটি মুখ থেকে শুধুমাত্র লাভা উদ্গিরণ হতে শুরু করেছে। এই ক্ষোভের আগ্নেয়গিরি যখন শতমুখে লাভা উদ্গিরণ করবে তখন সেই আগুন থেকে কারও রেহাই নেই সে যতই শক্তিশালী হোক না কেন।**

নারকীয়তাকে ঢেকে ফেলে অত্যাচারীদের বাঁচানোর খেলায় নেমেছেন। মনে রাখবেন চালাকি দিয়ে বুদ্ধির খেলা দিয়ে প্রশাসনিক ছলচাতুরি দিয়ে চিরকাল সত্যকে ঢেকে রাখা যায় না।

রিপাবলিক বাংলার সাংবাদিক সন্তু পানকে আটকে রাখতে পারলেন না। মিথ্যা মামলা দিয়ে সংবাদ জগতকে স্তব্ধ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু লাভ হলো না। সন্দেশখালি কাণ্ডে মমতা ব্যানার্জীর পরে আর যদি কেউ সবচাইতে বেশি ঘৃণা কুড়িয়ে থাকে সেটা হচ্ছে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। আমি একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমজনতার মন যতখানি পড়তে পেরেছি তার থেকে এই কথাগুলো আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে লিখলাম। পড়াশুনা করে আইপিএস হওয়া সহজ কথা নয়। কিন্তু এরকম আইপিএস হয়ে যদি সেই অত্যাচারীর দালাল হয়ে সমাজে নিপীড়ন চালানো হয় তাহলে ধিক্কার এরকম পড়াশোনাকে, ধিক্কার এরকম ট্যালেন্টকে। ২০১৯ সালে সিএএ বিরোধী আন্দোলনের সময় বেশ কিছু বড়ো বড়ো আলোচনা সভায় অংশ নিয়েছিলাম। সেই আলোচনা সভায় আমার সহ-বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত। সে সময় অবশ্য উনি বিজেপির নেতা। প্রত্যেকটা সভাতে উনি একটা ঘটনা বলতেন তা হলো বাংলাদেশের অনেক জায়গাতেই হিন্দু মায়েদের, বোনেদের জেহাদিরা তুলে নিয়ে যায় এবং তাদের লালসা তৃপ্তির পর আবার বাড়িতে ফেরত দিয়ে যায়। এর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ প্রতিরোধ করলে মৃত্যু নিশ্চিত।

রন্তিদেববাবু বাংলাদেশের দৃষ্টান্ত তুলে

ফঃ ২

সবাইকে সাবধান করতেন যে যদি সিএএ চালু না হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গেও একই পরিস্থিতি তৈরি হবে। সন্দেশখালিতেও বাংলাদেশের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। মমতা ব্যানার্জীর আশীর্বাদপুষ্ট শেখ শাজাহানের চেলাচামুণ্ডারা ওদের পছন্দ মতো হিন্দু মা-বোনেদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আসছে এবং ওদের লালসা তৃপ্তির পর বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে আসছে। এক্ষেত্রে কাউকে হয়তো এক রাত কাউকে হয়তো দু'তিন রাতও কাটাতে হয় শাজাহান বাহিনীর ডেরায়। কোনোরকম প্রতিবাদ প্রতিরোধ হলে নেমে আসছে প্রত্যক্ষ মৃত্যুর পরোয়ানা। শুধু মা-বোনদের মান-সম্মানই নয়, কতজনের যে চাষের জমি বসতবাড়ি জবরদখল করে শাজাহান বাহিনীর লোকেরা দখল করে রেখেছে তার কোনো হিসেব নেই। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার দৌলতে সে অত্যাচারের কাহিনি দেখে কখনো মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা, বাংলাদেশের চাইতেও বিপজ্জনক। বাম জমানা থেকে শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেস আসার পরও বছরের পর বছর ধরে সন্দেশখালির মানুষের ভোট দেওয়ার অধিকার নেই। ওদের শাসানো হয় এই বলে তৃণমূলকে ভোট না দিলে গুজরাট চলে যেতে হবে। ঠিক যেমন বাংলাদেশের জেহাদিরা হিন্দুদের শাসায়, ওদের কথা না শুনলে পরে ভারতে চলে যেতে হবে। আজকে সন্দেশখালির মা-বোনেদের আর্তনাদ সামনে আসার পর রন্তিদেববাবুর সেই বক্তব্য আবার কানে ভেসে আসছে। বাংলাদেশে যেমন হিন্দু মা-বোনেদের এবং হিন্দুদের ধনসম্পত্তির কোনোরকম নিরাপত্তা নেই ঠিক একই চিত্র আমরা সন্দেশখালির ক্ষেত্রেও দেখতে পাচ্ছি।

মমতা ব্যানার্জির জয় বাংলা স্লোগান নিয়ে সমালোচনা করতে গিয়ে অনেকেই বলেন উনি পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ বানাতে চাইছেন। কিন্তু সন্দেশখালির ঘটনা সামনে আসার পর আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ হতে এতটুকু বাকি নেই। সেইসব মঞ্চে দাঁড়িয়ে রন্তিদেববাবু যে সাবধান বাণী উচ্চারণ করতেন সে কথা আজ অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাচ্ছে। উনি দেখি আজকাল উত্তরবঙ্গ সংবাদে নিয়মিত কলাম লিখছেন। অবশ্য এখন উনি লিখছেন মমতা ব্যানার্জীর হয়ে। আশা করেছিলাম ওনার ভবিষ্যদ্‌বাণী ফলে গেল এই দাবি করে অন্তত দু'চারটে কলাম লিখবেন। কিন্তু না, এই লেখা শেষ করা পর্যন্ত সেরকম কোনো আর্টিকল্ বা বক্তব্য রন্তিদেববাবুর কলম থেকে বা মুখ থেকে বের হয়নি।

রন্তিদেববাবু একা নন এরকম তথাকথিত কলমধারী স্বার্থান্বেষীতে পশ্চিমবঙ্গ ভরে গেছে। হস্তিনাপুরের রাজসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ দেখে ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কর্ণের মতো কাণ্ডজ্ঞানহীন দিব্যজ্ঞানীরা যেন কিছুই দেখতে পাননি এবং শুনতেও পাননি। সেদিন দ্রৌপদীর আর্তনাদ এদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করলেও এরা সেইদিন ছিলেন নিস্পৃহ, নিষ্পলক। আজকের দিনেও সন্দেশখালির মায়েদের আর্তনাদ যেন পশ্চিমবঙ্গের কোনো বুদ্ধিজীবীর কানেই প্রবেশ করছে না। কৌশিক সেন, শুভাপ্রসন্ন, অপর্ণা সেনরা যেন কিছু দেখতেও পাচ্ছেন না, শুনতেও পাচ্ছেন না। জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কিংবা মমতা ব্যানার্জীর মতো রাজনৈতিক জল্লাদরা চিরকাল মানুষের উপর নির্যাতন চালাবে এটা সত্য। কিন্তু মানুষ বেশি কষ্ট পায় এই বুদ্ধিজীবী তকমাধারী, উচ্চশিক্ষিত পুলিশ অফিসার নামধারী স্বার্থান্বেষীদের আচার-আচরণ দেখে। মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে যেমন রাজনীতিবিদরা ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেন, তেমনি বুদ্ধিজীবী তকমার পিছনেও সেই মানুষই। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ বেদনা প্রত্যাশা তুলে ধরেই একদল ব্যক্তি বুদ্ধিজীবী তকমা পান। সেজন্যই আমজনতা আর দশটা মানুষের চাইতে ওদের বেশি বিশ্বাস করেন ভরসা করেন। কিন্তু নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য যখন এরা বিক্রি হয়ে যান তখন আমজনতার মনে আঘাত লাগে।

সন্দেশখালির মায়েদের মতো একই অভিযোগ এসেছে দিনহাটা থেকেও। সেখানেও রাত্রিবেলা পিঠে বানানোর জন্য মায়েদের রাত্রিবেলা তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়েছে এমন অভিযোগ এসেছে। একুশের বিধানসভা নির্বাচনের পর যে পোস্ট-পোল ভায়োলেন্স হয়েছিল সেসময় অনেক বাড়ি থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা, সবুজ সাথীর সাইকেল তৃণমূলের জেহাদিরা ফেরত নিয়েছিল। আমার ধারণা এই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে ব্ল্যাকমেলের শিকার পশ্চিমবঙ্গের অগণিত মা-বোন। এই জেহাদিদের লালসার আগুনে সারা পশ্চিমবঙ্গ আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হয়েছে। সন্দেশখালিতে সেই আগ্নেয়গিরির একটি মুখ থেকে শুধুমাত্র লাভা উদ্‌গিরণ হতে শুরু করেছে। এই ক্ষোভের আগ্নেয়গিরি যখন শতমুখে লাভা উদ্গিরণ করবে তখন সেই আগুন থেকে কারও রেহাই নেই সে যতই শক্তিশালী হোক না কেন।

ইতিহাসের নির্মম কশাঘাত থেকে কারও রেহাই নেই। মহাভারতের মহাবলীরাও যেমন রক্ষা পাননি। তেমনই বর্তমানকালের চতুর বুদ্ধিজীবী, নৃশংস রাজনীতিকরাও রক্ষা পাবেন না। □

With Best Compliments from -

A Well Wisher

মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু হত্যা

মানবতাবাদের সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছিল শাসক বামফ্রন্ট

ড. রুবি সাঁই

বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে যে সকল নির্মম গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম হলো মরিচঝাঁপি গণহত্যা। এই গণহত্যা মানবতার সকল সীমাকে অতিক্রম করেছিল। যাদের হত্যা করা হয়েছিল তারা ছিল দেশভাগের বলি উদ্বাস্তু, ছিন্নমূল, প্রান্তিক ও হতদরিদ্র মানুষ। তারা সীমান্ত অতিক্রম করতে বাধ্য হয়েছিল নিজেদের জীবন এবং মা-বোনেদের সম্মান বাঁচাতে। যে যন্ত্রণা ও প্রাণনাশের ভয়ে অসংখ্য মানুষ নিজ দেশ ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের নোনাজল ও সাপ-কুমির-বাঘ পরিবেষ্টিত বসবাসের অনুপযোগী পরিবেশে লড়াই করে বেঁচে থাকার জন্য যে স্বপ্নে ঘর বেঁধেছিল তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বরং তাদের জীবন পুনরায় অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। এমনকী বহু মানুষ প্রাণ হারায় এবং অসংখ্য মানুষকে নির্বাসিত করা হয় কৃষি কাজের অনুপযোগী, পানীয় জলের অনুপযোগী মধ্যপ্রদেশ-ওড়িশার সীমান্ত সংলগ্ন দণ্ডকারণ্যে। যে রাজনৈতিক দল এই ছিন্নমূল, প্রান্তিক, হতদরিদ্র মানুষদের ভাবাবেগ ও বেঁচে থাকার শেষ স্বপ্নকে হাতিয়ার করে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করেছিল সেই রাজনৈতিক গোষ্ঠী হলো কমিউনিস্ট মতাদর্শের 'বামফ্রন্ট'।

যারা স্বপ্ন দেখিয়েছিল ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল নিজেদের সংস্কৃতি ও ভাষাগত পরিবেশে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় দণ্ডকারণ্যের অসংখ্য উদ্বাস্তু, ছিন্নমূল মানুষকে পুনর্বাসন দেবে।

কিন্তু সেই রাজনৈতিক দলের পূর্বপরিকল্পিত ও ক্ষমতা ধরে রাখার প্রতিযোগিতায় এই সমস্ত অসংখ্য উদ্বাস্তু, ছিন্নমূল মানুষের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি, বরং সাক্ষী হতে হয় মানবতার সকল সীমা অতিক্রমকারী এক বর্বর গণহত্যার।

১৯৭৯ সালের মরিচঝাঁপি গণহত্যার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ১৯৪৭ সালের দেশভাগের সঙ্গে অনেকটা সম্পর্কিত। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনের সঙ্গে বঙ্গপ্রদেশও দ্বিখণ্ডিত হয়। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গ পাকিস্তান এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৪৬-১৯৫২ সালের মধ্যে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত অসংখ্য উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে অনেকটা সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু অসংখ্য বাঙ্গালি সেই সময় পূর্ববঙ্গে রয়ে যায় যাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষ।

জিন্নার মৃত্যুর পর পাকিস্তানে ক্রমেই সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর সাম্প্রদায়িক আক্রমণ বাড়তে থাকে। অবশেষে ১৯৬৪ সালের হজরতবালের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত ও পাকিস্তানে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ শুরু হয়। অসংখ্য নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষ বনগাঁ, গেদে, রানাঘাট সীমান্ত দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আসতে থাকে। ইতিপূর্বে পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পুনর্বাসনের কিছুটা ব্যবস্থা হলেও ১৯৫২–১৯৬৫ সালে আগত উদ্বাস্তুদের সীমিত সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন উদ্বাস্তু ক্যাম্পে পাঠানো হয়। তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের হিসেব অনুযায়ী বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু শরণার্থী আগমনের ফলে পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্ভব নয় বলে ঘোষণা করে। যার ফলে ১৯৫৩ সাল থেকে শরণার্থী উদ্বাস্তুদের আন্দামান পাঠাতে শুরু করে। ১৯৫৬ সালে দণ্ডকারণ্য প্রজেক্ট অর্থাৎ মধ্যপ্রদেশ-ওড়িশার মালকানগিরি-সহ ভারতের দুর্গম প্রান্ত যেখানে মানুষ বসবাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী সেই সমস্ত স্থানে এই ভিটেমাটি হারানো, হতদরিদ্র, ছিন্নমূল, প্রান্তিক মানুষদের জোর করে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাঠানো হয়।

এরকম এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে তৎকালীন বামপন্থী নেতৃবর্গ দণ্ডকারণ্যে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের বেঁচে থাকার অনুপযোগী পরিবেশ থেকে বাঙ্গালি সংস্কৃতিতে পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়ে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস

সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন শক্তিশালী করে তোলে। অবশেষে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট উদ্বাস্তু ভাবাবেগকে ভোটব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করতে সফল হয়, কিন্তু নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের হাসনাবাদ ও সুন্দরবন সংলগ্ন মরিচঝাঁপি দ্বীপে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র ধ্বংসকারী এবং সমাজবিরোধী আখ্যা দিয়ে মরিচঝাঁপি দ্বীপে চালায় নিষ্ঠুর গণহত্যা। কেবলমাত্র গণহত্যা নয় বরং এই গণহত্যাকে জনসম্মুখে আসতে না দেওয়ার জন্য প্রশাসনিক শক্তিকে ব্যবহার করতেও বামফ্রন্ট সরকার পিছু পা হয়নি।

উদ্বাস্তু, ছিন্নমূল মানুষরা নিজেদের ইচ্ছায় মরিচঝাঁপি ছেড়ে দণ্ডকারণ্যে ফিরে যেতে রাজি না হলে শুরু হয় সরকারি সন্ত্রাস ও অমানবিক অর্থনৈতিক অবরোধ। ১৯৭৯ সালের ২৬ জানুয়ারি ৩০টি পুলিশের লঞ্চ ঘিরে ফেলে মরিচঝাঁপি। ২৭ জানুয়ারি ১৪৪ ধারা জারি হয়। মরিচঝাঁপি থেকে বেরোনো এবং প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়। চালানো হয় কাঁদানে গ্যাস, উপড়ে ফেলা হয় মিষ্টি জলের টিউবয়েল, জ্বালিয়ে দেওয়া হয় উদ্বাস্তুদের ঘরবাড়ি। পাশের কুমিরমারি বা অন্য কোনো স্থান থেকে মরিচঝাঁপিতে খাদ্য, পানীয় জল, ঔষধপত্র সমস্ত কিছুই সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়, ফলে দণ্ডকারণ্য থেকে মরিচঝাঁপিতে আসা উদ্বাস্তুরা অনাহারে, তেষ্টায়, বিনা চিকিৎসায় দিশেহারা হয়ে পড়ে। কয়েক দিন পর থেকে অনাহারে ও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে কিছু মানুষ মারা যায়।

১৯৭৯ সালের ৩১ জানুয়ারি উদ্বাস্তুদের উপর প্রথম গুলি চলে, বাসিন্দাদের মতে ৩৬ জন মানুষ মারা যায়। এরই মধ্যে পুলিশের চোখ এড়িয়ে নদী সাঁতরে একজন উদ্বাস্তু কলকাতার প্রেসক্লাবে এসে কুমিরমারিতে গুলি চালানোর বিবরণ দিলে অমৃতবাজার পত্রিকা ফেব্রুয়ারি মাসে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। তাদের সংবাদপত্রে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু নিপীড়নের বৃত্তান্ত তুলে ধরে। রাজ্য বিধানসভায় কংগ্রেসের বিরোধী দলনেতা কাশীকান্ত মৈত্র মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু নিপীড়নের সরকারি প্রহসন সম্পর্কে জনমত তৈরি করেন এবং উদ্বাস্তুদের প্রতি অমানবিক অত্যাচারের প্রতিবাদে ওয়াক আউট করেন। মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের প্রতি অমানবিক অত্যাচার এবং অর্থনৈতিক অবরোধের বিরুদ্ধে বিচারের আশায় হাইকোর্টে মামলা করলে বিচারপতি উদ্বাস্তুদের পক্ষে রায় দেন। কিন্তু জ্যোতি বসুর সরকার হাইকোর্টের নির্দেশকে অমান্য করে, মরিচঝাঁপিকে অবরুদ্ধ করে রাখেন। এমনকী ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ও রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলি মরিচঝাঁপির অসহায় মানুষগুলিকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলে পুলিশ তাদেরও ফিরিয়ে দেয়। জ্যোতি বসু ও সি.পি.আই.এম নেতৃত্ব মরিচঝাঁপিতে অস্ত্র প্রশিক্ষণ শিবির চলছে বলে বিবৃতি তুলে ধরে প্রেসের উদ্দেশ্যে মন্তব্য করেন, এই ধরনের স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে উত্তেজক খবর পরিবেশন না করে জাতীয় স্বার্থে সরকারের অনধিকার প্রবেশকারীদের উচ্ছেদের সমর্থনে বক্তব্য রাখা উচিত। কেন্দ্রে তখন মোরাজী দেশাইয়ের টলমলে সরকার, জ্যোতি বসুর সমর্থন অত্যন্ত প্রয়োজন, তাই কেন্দ্র মরিচঝাঁপির ঘটনা জেনেও কোনো পদক্ষেপ না করাকে শ্রেয় মনে করেছিল। অর্থনৈতিক অবরোধ, ক্ষুধা এবং পিপাসায় ক্লান্ত মরিচঝাঁপি দ্বীপের অসহায় উদ্বাস্তু মানুষরা ঘাসপাতা খেয়ে মাটি কামড়ে পড়ে থাকে। খাদ্য হয়ে দাঁড়ায় গেঁড়ি গুগলি এবং নদীর ধারে গজানো যদু পালংশাক। ১৯৭৯ সালের ১৩ মে শুরু হয় চূড়ান্ত আক্রমণ। পুলিশ এবং স্থানীয় সি.পি.আই.এম এর গুন্ডাবাহিনী রাত্রের অন্ধকারে মরিচঝাঁপি আক্রমণ করে, নিরস্ত্র অসহায় হতদরিদ্র উদ্বাস্তু মানুষগুলির কুঁড়েঘরগুলিকে পুড়িয়ে দেয়। অনেক উদ্বাস্তু যুবক গ্রেপ্তার হন এবং উদ্বাস্তু মহিলাদের উপর চলে ধর্ষণ। পলায়নরত উদ্বাস্তুদের নৌকাগুলিকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। কমপক্ষে ১০০-১৫০ জন মানুষকে খুন করে ফেলে দেওয়া হয় নদীর জলে। তিন দিন ধরে তাণ্ডব চালানোর পর অবশেষে ১৯৭৯ সালের ১৬ মে মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তুশূন্য হয়।

মরিচঝাঁপি উচ্ছেদের পরে প্রায় ১০ হাজারেরও বেশি উদ্বাস্তু পরিবারকে দণ্ডকারণ্য পাঠানো হয়। ফেরার সময় অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারায় এবং মরিচঝাঁপিতে সরকারি সন্ত্রাসের পর কিছু উদ্বাস্তু পরিবার পুলিশের চোখ এড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে আত্মগোপন করে বসবাস করছেন তাদের সংখ্যা নির্ধারণ করা যায়নি। তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে সংবামমাধ্যম ততটা উন্নত না থাকা কিংবা ১৪৪ ধারা জারি করে মরিচঝাঁপি জুড়ে সাংবাদিদের প্রবেশ আটকে দেওয়ার মতো ঘটনাগুলি প্রকৃত তথ্যের সন্ধান পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। মরিচঝাঁপি গণহত্যা সম্পর্কে কিছু গবেষকের লেখা, তথ্যচিত্র, সাক্ষাৎকার এবং প্রত্যক্ষদর্শীর অভিমতকেই এই গণহত্যার প্রকৃত তথ্যের উৎস হিসেবে দেখা যেতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে অধ্যাপক অলক কুমার ঘোষ মরিচঝাঁপি গণহত্যা নিয়ে গবেষণা করে প্রকৃত তথ্য তুলে ধরার উদ্দেশ্যে জ্যোতি বসুর রাজত্বের শেষের দিকে একটি বই লিখেছিলেন। এই বইটিতে অমলবাবু মরিচঝাঁপি গণহত্যাকে 'দ্বিতীয় জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড' বলে অভিহিত করেন। কিন্তু জ্যোতি বসু সরকার পরিকল্পিতভাবে এই বইয়ের প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়।

মরিচঝাঁপি গণহত্যা নিয়ে তথ্যনিষ্ঠ গবেষণা করেছেন ইতিহাসের অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল তার ভাষায় 'জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে মরিচঝাঁপি গণহত্যা অত্যন্ত হৃদয় বিদায়ক ঘটনা।' অবশ্য কমিউনিস্টদের এই ধরনের অপকর্ম নতুন কোন ঘটনা নয়। পৃথিবীতে কমিউনিস্ট শাসনের জন্মলগ্ন থেকেই এই প্রকার গণহত্যা সংগঠিত হয়ে চলেছে। রাশিয়ায় লেনিনের সময় যাজকদের হত্যা করা হয়। স্ট্যালিনের সময় ২ কোটি মানুষকে হত্যা করা হয় এবং ২ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষকে নির্বাসনে পাঠানো হয়। কৃষি সংস্কারের নাম করে চীনের কমিউনিস্ট সরকার কয়েক লক্ষ কৃষককে

উৎখাত ও হত্যা করে। বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট শাসকরা প্রায় ৩০ হাজার মানুষকে হত্যা করে। কমিউনিস্ট শাসিত পূর্ব জার্মানিতে ৮০ হাজার থেকে ১ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে। পিয়ারে রিগৌলটের হিসাব অনুযায়ী উত্তর কোরিয়াতে প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ কমিউনিস্ট শাসনকালে খুন হন। Amnesty International এর হিসেব অনুযায়ী ইউথেপিয়াতে প্রায় ২.৫ লক্ষ মানুষ কমিউনিস্ট সরকারের হাতে নিহত হন। তিব্বতে চীনের কমিউনিস্ট সরকার কর্তৃক ৯২ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়। এই সকল পরিসংখ্যান থেকে সহজেই উনুমেয় যে, মরিচঝাঁপির গণহত্যা কমিউনিস্টদের কাছে নতুন কিছু নয়।

কমিউনিস্ট শাসকরা তাদের বিরুদ্ধে যে কোন ধরনের প্রতিবাদকে বন্দুকের নলে ধ্বংস করে দিতে বা বিরোধীদের গলা কেটে ফেলতে বদ্ধপরিকর। ২০১২ সালের ২৭ মে কেরালার ইদ্দুকি জেলার সি.পি.আই.এম সম্পাদক এম. এম. মনি একটি প্রকাশ্য সভায় বলেন যে 'বিরোধী কণ্ঠচ্ছেদ করতে কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টান্তের শেষ নেই।' তাই আমরা 'মরিচঝাঁপি' গণহত্যাকে কমিউনিস্ট শাসকদের পরম্পরাগত গণহত্যার অংশ রূপে চিহ্নিত করতে পারি। তুষার ভট্টাচার্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সমস্ত বিরোধিতা উপেক্ষা করে মরিচঝাঁপি গণহত্যা সম্পর্কে একটি অসামান্য তথ্যচিত্র প্রস্তুত করেছেন Watch 'MARICHJHANPI 1978-79. Tortured Humanity' on @ Vimeo https://Vimeo.com/ 23944832. জ্যোতি বসুর সরকার অসংখ্য উদ্বাস্তু মানুষের রক্তে হোলি খেলার পর শেষ পর্যন্ত মাত্র দুজন মানুষের মৃত্যু স্বীকার করে।

বামফ্রন্ট সরকারের রাজত্বকালে যে সকল গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে মরিচঝাঁপি গণহত্যা পৃথক দৃষ্টান্তের দাবি রাখে। কারণ এই গণহত্যায় যারা প্রাণ হারিয়েছিল তারা ছিল দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক আক্রমণে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে এবং মা-বোনেদের আত্মসম্মান

মরিচঝাঁপি গণহত্যার আজ প্রায় ৪৫ বছরেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত, কিন্তু প্রকৃত অপরাধীরা সাজা পাওয়া তো দূরের কথা, প্রকৃত সত্যও উদ্‌ঘাটিত হয়নি।

বাঁচাতে নিজ দেশের সমস্ত কিছু ফেলে রেখে উদ্বাস্তু হয়ে ভারতবর্ষে পাড়ি দিয়েছিল কেবলমাত্র বাঁচার আশায়। ভারতে আসার পর প্রথম যে সমস্যার সম্মুখীন তারা হলো, তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি পরিবেষ্টিত পরিবেশে পুনর্বাসন না দিয়ে দণ্ডকারণ্যের মালকানগিরি, মানা, কুরুত, আদিলাবাদ প্রভৃতি স্থানে তাদের পাঠানো হয়। দণ্ডকারণ্যের এই সমস্ত স্থান ছিল স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার সম্পূর্ণ অনুপযোগী। আর বামফ্রন্ট নেতৃত্ব রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের আন্দোলনকে তীব্র করে তোলে এই ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। উদ্বাস্তুদের ভাবাবেগকে ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করে বামফ্রন্ট নেতৃত্ব রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভে সফল হলেও নিজেদের দেওয়া প্রতিশ্রুতিকে কিন্তু মনে রাখেনি, বরং বামফ্রন্ট সরকার উদ্বাস্তুদের সামাজিক শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী এবং অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টিকারী বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী হিসেবে প্রতিপন্ন করে, তাদেরকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পিত পটভূমি তৈরি করে। উদ্বাস্তু উচ্ছেদের পটভূমিকায় রাজনৈতিক ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করার প্রবণতা যেমন ছিল, তেমনি প্রশাসনিক শক্তিকে ব্যবহার করে সূক্ষ্মভাবে সমস্ত তথ্য প্রমাণ নষ্ট করে দেওয়ার মতো জঘন্য খেলা বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের বুদ্ধিমত্তার অসাধারণ যৌক্তিক ব্যাখ্যা নির্মাণ করার আগে একবারও অনুভব করার চেষ্টা করেনি। মরিচঝাঁপির অসংখ্য উদ্বাস্তু, ছিন্নমূল মানুষের বুদ্ধিমত্তার অসাধারণ যৌক্তিক ব্যাখ্যা নির্মাণ করার আগে একবারও অনুভব করার চেষ্টা করেনি মরিচঝাঁপির অসংখ্য উদ্বাস্তু, ছিন্নমূল মানুষের জীবনের দুর্দশার কথা, বরং সরকারের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য উদ্বাস্তুদের Reserve Forest Act-এর আওতায় এনে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র নষ্টকারী হিসেবে প্রতিপন্ন করে।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের অসংখ্য দ্বিচারিতা সামনে আসে। যারা সমাজতন্ত্রের কথা বলে, যারা শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করার কথা বলে, যারা সর্বদা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে তারা মেহনতি খেটে খাওয়া মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর, পর্দার আড়ালে তারাই নৃশংস নরসংহারে মেতে ওঠে। বামফ্রন্ট সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সদিচ্ছা ও প্রকৃতি প্রেম যদি প্রকৃত সত্য হতো তাহলে সুপরিকল্পিত ও কার্যকরী ব্যবস্থা তারা পশ্চিমবঙ্গেই গ্রহণ করতে পারত।

মরিচঝাঁপি গণহত্যার আজ প্রায় ৪৫ বছরেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত কিন্তু প্রকৃত অপরাধীরা সাজা পাওয়া তো দূরের কথা, প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়নি। যে রাজনৈতিক দলের ক্ষমতায় আগমন দ্বিচারিতার মধ্য দিয়ে, যে দলের নেতৃত্ব একসময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 'বড়লোকের কবি' বলে ব্যঙ্গ করেছিল, ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে যারা বিরোধিতা করেছিল, নেতাজী সুভাষ চন্দ্রকে যারা 'তোজোর কুকুর' বলেছিল, ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পক্ষে যারা সওয়াল করেছিল, ১৯৬২ সালে ভারত চীন যুদ্ধে চীনের প্রতি যারা দরদ দেখিয়েছিল, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আজ বিশ্বের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়েছে। পৃথিবী থেকে আজ তারা বিলুপ্ত হতে চলেছে। □

মোক্ষম প্রশ্ন তুলেছেন শীর্ষ আদালত
উত্তরের অপেক্ষায় গোটা দেশ

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

ভারতীয় সংবিধানের প্রিঅ্যাম্বল্ বা প্রস্তাবনায় 'সোশ্যালিস্ট ও 'সেক্যুলার' শব্দদুটি সংযোজনের তারিখ নিয়ে প্রশ্ন তুলল শীর্ষ আদালত। গত ৯ ফেব্রুয়ারি, শীর্ষ আদালত প্রশ্ন তুলেছে ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর প্রস্তাবনা-সহ মূল সংবিধান কার্যকরের দিন, সেই তারিখ থেকে ১৯৭৬ সালে সংশোধিত প্রস্তাবনা চালু হয়েছে বলা হচ্ছে, তা কী করে সম্ভব?

সংবিধানের প্রস্তাবনা যেভাবে ১৯৭৬ সালে সংশোধন (৪২তম সংবিধান সংশোধন, ১৯৭৬ নামে পরিচিত) হয়েছিল, 'সোশ্যালিস্ট' ও 'সেক্যুলার' শব্দদুটি ঢুকিয়ে তা বদলের আর্জি জানিয়ে মামলা দায়ের করেছেন বিজেপি সাংসদ সুব্রহ্মণ্যম স্বামী ও আইনজীবী বিষ্ণুশঙ্কর জৈন।

এই সংশোধনকে ক্ষুদ্র সংবিধানও বলা হয়, এত বেশি পরিবর্তন হয়েছিল তাতে, ৫৯টা ক্লজ ছিল, বিচারব্যবস্থার ওপর কাঁচি চালানো হয়েছিল, সংসদের ওপর সার্বভৌম ক্ষমতা আরোপ করে। সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে বিচারব্যবস্থার কোনও কথা বলার এক্তিয়ার ছিল না।

এঁদের মামলার ওপর ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ শুনানি হয় বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের এজলাসে। এদিন বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত জানান সংবিধান কার্যকর হওয়ার দিন পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। আবার সংশোধনের তারিখ থেকে উপরোক্ত

শব্দদুটি চালু হয়েছে বলা যায় কিন্তু তাতো বলা হচ্ছে না। সংশোধিত সংবিধানে বলা হয়েছে ২৬ নভেম্বর, ১৯৪৭ থেকে এই প্রস্তাবনা চালু।

সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা মূল সংবিধান রাখা থাকত সংসদ ভবনে। সেখানে প্রস্তাবনা যা কিনা সংবিধানের প্রাণভোমরা তাকে বদল করা হয়েছে জরুরি অবস্থায়। তখন মূল সংসদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থার সুযোগে লোকসভার মেয়াদ এক বছর বাড়িয়ে নেন। এটা অবশ্য করতে পারেন। তবে এই লোকসভা এক বছরের বেশি টিকিয়ে রাখা হয়নি। ইন্দিরা গান্ধী মার্চ, ১৯৭৭ সালে লোকসভা ভেঙে নির্বাচন ডাকেন। পাঁচ বছর ১০ মাস ছয় দিন চলেছিল লোকসভা।

সেই সময়ে দেশে ঘোর কংগ্রেসী অত্যাচার চলছে। বহু নেতা জেলবন্দি হয়েছিলেন। অনেকে গ্রেপ্তারের ভয়ে লুকিয়ে পড়েছিলেন। ১৯৮২ বাজপেয়ীজী বলেছিলেন, 'আমরা সব ভিতরে, কংগ্রেসীরা সব বাইরে, আর সিপিআইএম নেতারা 'বিচ মে', মানে লুকিয়ে পড়েছিলেন। সংসদে কোনো বিতর্ক ছাড়াই তা গৃহীত হয়েছিল। অসম্ভব মনে হলেও সংবিধানের মূল ভিতটাকেই নড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল কোনো সদর্থক আলোচনা বা বিপক্ষের মতামতের তোয়াক্কা না করেই।

বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত জানিয়ে দেন ভারতের সংবিধানের এই প্রস্তাবনাতেই তারিখ উল্লেখ রয়েছে। আদি সংবিধানের প্রস্তাবনায় সেক্যুলার ও সোশ্যালিস্ট শব্দদুটির উল্লেখ নেই। কোনও আলোচনা ছাড়াই প্রস্তাবনাকে সংশোধন করা যায় না। এই সময়েই মামলাকারী সুব্রহ্মণ্যম স্বামী উল্লেখ করেন, ৪২তম সংবিধান সংশোধন ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৬ জরুরি অবস্থা জারির সময়ে করা হয়েছিল। উল্লেখ্য ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমেই সংবিধানের প্রস্তাবনায় সেক্যুলার ও সোশ্যালিস্ট শব্দদুটি ঢোকানো হয়।

সংবিধান গৃহীত হওয়ার ২৭ বছর পরে প্রস্তাবনার সংশোধন হয়েছিল কিন্তু সেই সংশোধিত প্রস্তাবটি 'নভেম্বর ২৬, ১৯৪৯' তারিখটি ধরে রেখেছে। প্রস্তাবনার শেষ অংশে বলা হয়েছে, '...আমাদের গণপরিষদে, ১৯৪৯ সালের নভেম্বরের এই ২৬তম দিনে, আমরা এই সংবিধানটি গ্রহণ করি, প্রণয়ন করি এবং নিজেদেরকে প্রদান করি'। কিন্তু ইন্দিরার নেতৃত্বে লোকসভা ৪২তম সংশোধনের জোরে মূল তারিখটি অবিকল রেখে দেন শুধু পাদটীকায় লেখা হয় যে ৪২তম সংবিধান সংশোধন আইন, ১৯৭৬।

উল্লেখিত জনস্বার্থ মামলায় দাবি করা হয়েছে যে প্রস্তাবনার একটি নির্দিষ্ট তারিখ থাকে এবং এইভাবে আলোচনা ছাড়া সংশোধন করা যায় না। প্রশ্ন উথাপন করে বিচারপতি দত্ত বলেছিলেন যে তিনি ইঙ্গিত করছেন

না যে প্রস্তাবনা সংশোধন করা যাবে না তবে অবশ্যই অ্যাকাডেমিক স্তরে বিবেচনা করা উচিত যে সংবিধানে একটি তারিখ উল্লেখ রয়েছে, সেই তারিখ পরিবর্তন ছাড়া সংশোধন করা যায় কিনা।

'ঠিক সেই প্রশ্নই আমরা করছি।' কৌঁসুলি বলেন, ইঙ্গিত ছিল যে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন তৎকালীন সরকার দ্বারা জারি করা জরুরি অবস্থার সময় দুটি শব্দ যোগ করা হয়েছিল। এরপর বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তর বেঞ্চ জানিয়ে দেন এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে আগামী ২৯ এপ্রিল, ২০২৪।

সংবিধান অনুসারে, ভারতে সংসদ এবং রাজ্য আইনসভার নিজ এক্তিয়ারে আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে। এই ক্ষমতা প্রকৃতিগতভাবে চরম নয়। সমস্ত আইনের সাংবিধানিক বৈধতা বিচার করার ক্ষমতা বিচার বিভাগের উপর ন্যস্ত করেছে সংবিধান। সংসদ বা বিধানসভা প্রণীত আইন সংবিধানের নির্দেশ লঙ্ঘন করলে, সুপ্রিম কোর্টের এই ধরনের আইনকে অবৈধ ঘোষণা করার ক্ষমতা রয়েছে। এসত্ত্বেও, সংবিধান নির্মাতারা সংবিধানকে 'কঠোর কাঠামো'র বদলে 'অভিযোজিত দলিল' করতে চেয়েছিলেন। তাই সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা সংসদ বা বিধানসভাকে দেওয়া হয়েছিল। সংবিধানের ৩৬৮ অনুচ্ছেদ ধারণা দেয় যে সংসদের সংশোধনী ক্ষমতা নিরঙ্কুশ যা সংবিধানের সমস্ত অংশকে অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট স্বাধীনতার পর থেকেই সংসদের আইন প্রণয়নের অত্যুৎসাহে 'ব্রেক' হিসেবে কাজ করেছে। সংবিধান প্রণেতাদের পরিকল্পিত মূল আদর্শ সংরক্ষণের অভিপ্রায়ে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে সংসদ সংশোধনের অজুহাতে সংবিধানের 'মৌলিক কাঠামোগুলিকে বিকৃত, ক্ষতি বা পরিবর্তন করতে পারবে না'। কিন্তু 'মৌলিক

সংবিধানের মূল কাঠামো নিয়ে বিচারকদের মতানৈক্য ছিল কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মেনে নিয়েছিলেন যে সংবিধানের একটি অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু আছে যা পবিত্র, অপরিবর্তনীয়। ইঙ্গিত স্পষ্ট যে ৪২তম সংশোধন এই মৌলিক কাঠামো বিকৃত করেছে সোশ্যালিস্ট ও সেক্যুলার শব্দদুটি ঢুকিয়ে।

কাঠামো' শব্দটি সংবিধানে নেই। ১৯৭৩-এ ঐতিহাসিক 'কেশবানন্দ ভারতী মামলায়' সুপ্রিম কোর্ট প্রথম এই ধারণাটিকে স্বীকৃতি দেয়। তখন থেকে সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যাকার এবং সংসদ কর্তৃক প্রণীত সকল সংশোধনীর মধ্যস্থতাকারী।

'কেশবানন্দ ভারতী বনাম দ্য স্টেট অব কেরালা' মামলার রায় অনুযায়ী সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য :

১৩ জন বিচারপতির ফুলবেঞ্চ ৭-৬ দুই ভাগ হয়ে যায়। সংখ্যাগরিষ্ঠের মত প্রকাশ পায়। আবার প্রত্যেক বিচারক সংবিধানের 'মৌলিক কাঠামো'র পরিধি সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেছেন। শুধু বিচারপতি যশবন্ত বিষ্ণু চন্দ্রচুড়ের দ্বারা উল্লেখিত চারটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করব যা তিনি অপরিবর্তনীয় বলে মনে করেছিলেন তার প্রথমটি হলো :

সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মর্যাদা।

ঠিক এইটাই মূল প্রস্তাবনায় ছিল। ৪২তম সংশোধনীর ফলে সোশ্যালিস্ট ও সেক্যুলার শব্দদুটি যুক্ত হয়েছে তারিখ অবিকৃত রেখে।

সংবিধানের মূল কাঠামো নিয়ে বিচারকদের মতানৈক্য ছিল কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মেনে নিয়েছিলেন যে সংবিধানের একটি অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু আছে যা পবিত্র, অপরিবর্তনীয়। ইঙ্গিত স্পষ্ট যে ৪২তম সংশোধন এই মৌলিক কাঠামো বিকৃত করেছে সোশ্যালিস্ট ও সেক্যুলার শব্দদুটি ঢুকিয়ে। □

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম- ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

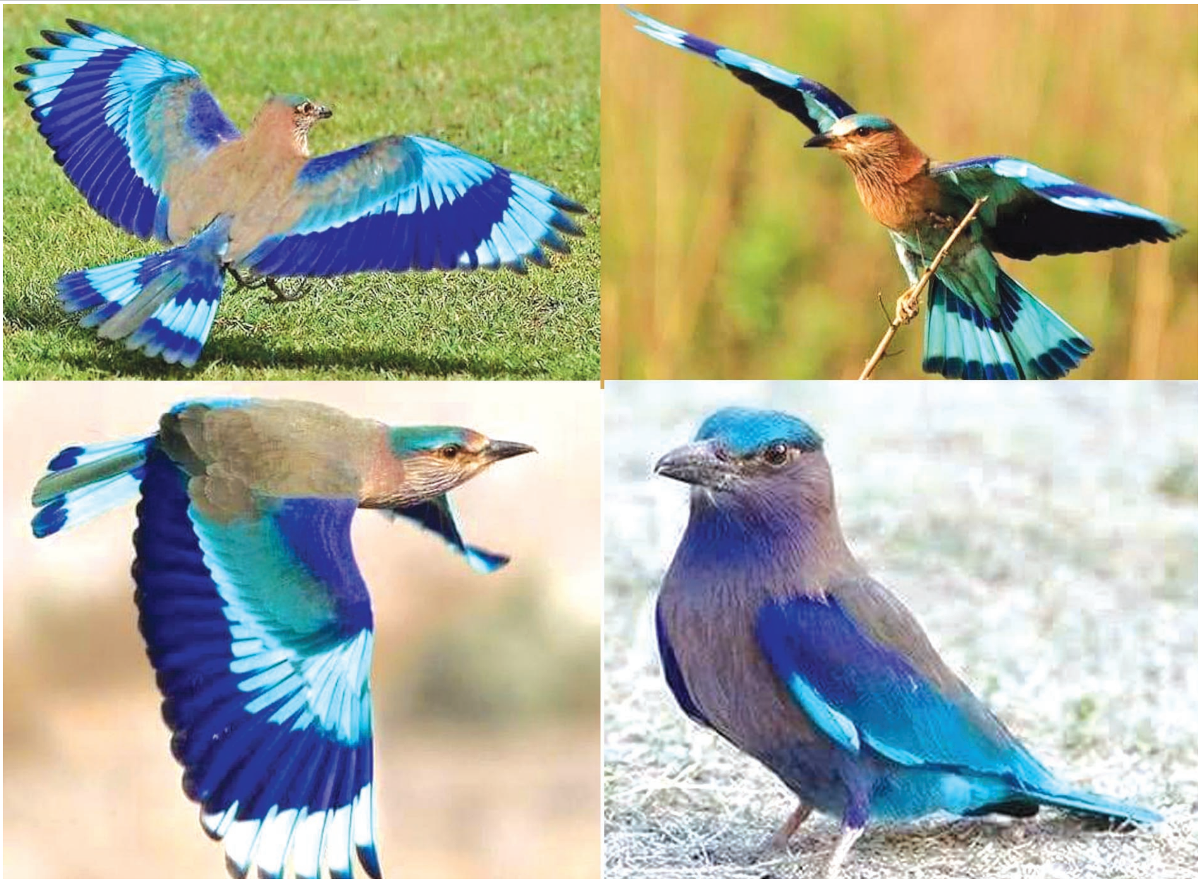

নীলকণ্ঠ পাখি

সৈকত চট্টোপাধ্যায়

ভগবান শিবের অন্যতম প্রিয় পাখি হচ্ছে নীলকণ্ঠ। লোকবিশ্বাস এই যে, শিবের গরল পানের সময় সেও নাকি নিয়েছিল বিষ, নিজের গলায়। তাই তার অবয়বে আজ গরলের নীলচে ছোঁয়া। শিবের বার্তাবহ এই পাখি, দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে শিবজায়াকেও দশমীতে ডাক দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

সপরিবারে মর্ত্যে এসেছেন স্ত্রী, শিব বড্ড একা! কৈলাসবাসী, পরিবার-কেন্দ্রিক শিবের তর সয় না। দুর্গাকে পথ দেখিয়ে ফিরিয়ে আনতে হবে। তাই শিব নীলকণ্ঠ পাখিকে উড়িয়ে দেন। এই হলো মিথ-পুরাণের লোকবিশ্বাসের কথা।

পাখিটির ইংরাজি নাম— The Indian Roller, বিজ্ঞানসম্মত নাম *Coracias benghalensis*, Coraciidae পরিবারের অন্তর্গত। এই পাখির দেখা মেলে পশ্চিম এশিয়া থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে।

মিথ-পুরাণে জারিত হয়ে বিজয়া দশমীর দিন একদা নীলকণ্ঠ পাখি ওড়ানো ছিল বাঙ্গলার লোকাচারের অঙ্গ। তার জন্য ব্যাপক হারে নীলকণ্ঠ পাখি ফাঁদ পেতে ধরা হতো গাঁয়ের মাঠ-ঘাট থেকে। পাখির বন্দিদশায় পাখমারারা কোনো খাবার পরিবেশন করতো না পাখিটিকে। প্রকৃতিতে এরা নানান উড়ন্ত পোকা ধরে খায়। পাখি হাটের হাটুরেদের অথবা দুর্গাপূজার আয়োজকদের জানা থাকত না, এ পাখির খাদ্যতালিকায় কী দেওয়া যায়। তারা পরিবেশন করতেন ভেজা ছোলা, মটর, কলাই। দিতেন সাত্ত্বিক খাবার, যা এদের একেবারেই খাদ্য নয়। এভাবে অনশনে পাখিগুলি আধমরা হয়ে যেত। যখন উড়িয়ে দেওয়া হতো এই পাখি, তখন অবসন্ন পাখির জীবনাবসান ঘটত। যদিও এ ছিল অনিচ্ছাকৃত মৃত্যু। তবে কীটনাশকের বিষক্রিয়াতে ব্যাপকহারে নীলকণ্ঠ পাখির মৃত্যু ঘটেছে দেশ জুড়ে। এখন এর সংখ্যা তাই ক্রমশ কমছে। অপরূপ সুন্দর এই পাখি, উড়ন্ত নীলকণ্ঠ পাখির সৌন্দর্য থেকে মুখ ফেরানো যায় না।

(কৃতজ্ঞতা অধ্যাপক ড. কল্যাণ চক্রবর্তী)

বশ্যতা বিরোধী লড়াই চলছে নন্দীগ্রাম হবে সন্দেশখালি

কথায় আছে নির্মাণের পরই ভাঙনের পালা। শুভেন্দুর দাবি, পুলিশ সন্দেশখালিতে প্রশাসনের হয়ে নয়, দলের হয়ে কাজ করছেন। এতে বেশিদিন আর নেই যেখানে নন্দীগ্রাম হতে চলেছে সন্দেশখালি। নন্দীগ্রামে জমিদখল নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়েছিল আর এখানে নারীদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাচ্ছে স্থানীয় সাধারণ মানুষ। শুধু তাই নয় জমি দখলও একটা বড়ো ইস্যু।

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা বলেন সন্দেশখালির বর্তমান পরিস্থিতি বুঝিয়ে দিচ্ছে আগামীদিনে মানুষ নরেন্দ্র মোদীকে ভরসা করছে। সন্দেশখালির মানুষ বশ্যতা বিরোধী আন্দোলনে নেমেছেন। নন্দীগ্রামে যে কারণে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল তা ছিল রাজ্য সরকারের তরফে কৃষিজমি অধিগ্রহণের অনৈতিক সিদ্ধান্ত। এখানে সন্দেশখালিতে শাজাহান বাহিনীর জমি দখল থেকে নারী ও মায়েদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন গরিব মানুষজন। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর লোকসভা থেকে বিধানসভা ও পঞ্চায়েতের ভোট-লুট গণতন্ত্র হত্যা, সীমাহীন নারীনির্যাতন আর জমিদখল এই তিনটি কারণে মানুষ বশ্যতাবিরোধী আন্দোলনে সোচ্চার হয়েছে।

অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়িয়ে অবলীলাক্রমে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে দুর্নীতির খবরের শিরোনামে আজ টিএমসি। কি করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী? কোথায় তাঁর প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন, কি ভূমিকা রাখলেন রাজ্যের পদস্থ মন্ত্রীগণ যারা পাশে দাঁড়িয়ে শেখ শাজাহানের মতো ক্রিমিনালকে সুপ্রিমকোর্টের দোহাই দিয়ে ঠেকিয়ে রাখে? সেই রাজনৈতিক নেতাদের তীব্র ঘৃণা ও ধিক্কার জানাই। জয়ী হোক সংগ্রামী মানুষ, জয়ী হোক গৈরিক ধ্বজ। সন্দেশখালির প্রত্যেক ঘরে তৈরি হোক দেবী দশভুজা আর শেখ শাজাহানের মতো অসুরকে নিধন করে শান্তি আনুক পশ্চিমবঙ্গে।

—সম্রাট শীল,
বরানগর।

গাছ লাগান জল-সম্পদ বাঁচান

কথায় আছে গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান, কিন্তু এখন আমার মনে হয় বলতে হবে গাছ লাগান জল বাঁচান। অবশেষে ট্রিগার টেনে দিল প্রকৃতি। ইতিমধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার রাজধানী কেপটাউনকে বিশ্বের প্রথম খরা শহর ঘোষণা করা হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার ১৪ এপ্রিল, ২০২৩-এর পর জল সরবরাহ করতে অক্ষমতার ইঙ্গিত দিয়েছেন। এমন সময় আমাদেরও আসতে পারে।

জল কম অপচয় করুন। ভুলে যাবেন না যে পৃথিবীর জলের মাত্র ২.৭ শতাংশ পানযোগ্য। আপনার এলাকার মানুষদের একথা জানান। আশেপাশের সব বাঁধে জলস্তর নেমে গেছে। একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে আপনি এই আন্দোলনকে সফল করতে পারেন।

(১) প্রতিদিন জল অপচয় বন্ধ করুন।

(২) বিভিন্ন উপায়ে জল সংরক্ষণ করুন।

(৩) একটানা জলের কল চালানো বন্ধ করুন।

(৪) গাছ লাগান বেশি করে আর পরিবেশকে জল শূন্যতার হাত থেকে রক্ষা করুন।

আসুন আমরা একসঙ্গে এই ভয়াবহ সংকটের মোকাবিলা করি, তবেই আগামী প্রজন্ম জলহীনতা থেকে রক্ষা পাবে।

—শুভময় দেব,
বারুইপুর, কলকাতা।

গণতন্ত্রই জনগণের একমাত্র পরিত্রাণ ব্যবস্থা

মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অবদান গণতন্ত্র। সেই গণতন্ত্রকে ভস্মীভূত করে থাকে সন্ত্রাসবাদ। আবার গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে সুস্থ ও সুন্দর রাখতে পারে বিচার বিভাগ। মানবতা ও গণতন্ত্রের শত্রু সন্ত্রাসবাদ। এই সন্ত্রাসবাদকে হাতিয়ার করে কিছু দেশে কমিউনিস্ট শাসন কায়েম হয়েছিল। বন্দুকের নলের মুখে বিশ্বে প্রথম কমিউনিস্ট শাসন কায়েম হয়েছিল রাশিয়ায়। সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র নামে সারা বিশ্বে পরিচিত ছিল। শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থাপকদের এ প্রচার মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছিল। অর্থনৈতিক পতন এতই হয়েছিল যে ১৯৮৫ সালে প্রেসিডেন্ট গর্বাচেভকে দুটি সংস্কার প্রণয়ন করতে হয়। আর তাতেই তাদের সমাজতন্ত্রের সমাধি রচিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে যে দীর্ঘ কমিউনিস্ট শাসন বলবৎ ছিল, তাও ভারতের ইতিহাসে এক রক্তাক্ত পর্ব। ১৯৭০ সালে সাঁইবাড়ি হত্যা ১৯৭৯-তে মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তু হত্যা, ১৯৮২-তে আনন্দমার্গী সন্ন্যাসী হত্যা, ২০০০ সালে নানুরে গণহত্যা, ২০০৭ সালে নন্দীগ্রামে গণহত্যা মানবতার সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করেছিল। কমিউনিস্ট শাসনের আগে ভারতের অর্থনৈতিক হাব হিসেবে গণ্য হতো কলকাতা। কমিউনিস্ট শাসনে তা ধ্বংস হয়েছে। বিরোধীদের হত্যায় তারা জেহাদিদেরই ব্যবহার করতো।

জনগণ সে সরকারের পতন ঘটিয়ে তৃণমূল সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। কিন্তু বর্তমান সরকারও সেই সন্ত্রাসকে অতিক্রম করে আরও ঘৃণ্যতম সন্ত্রাসের

ফঃ ৩

পরিচয় দিচ্ছে। সন্দেশখালিতে মানবতা পদদলিত করছে। চাকরি, গোরু চুরি, কয়লা, বালি, গরিবের রেশন চুরি সব কিছুতেই দুর্নীতির চরম সীমা অতিক্রম করে চলছে। সব চাইতে মর্মান্তিক নারী ধর্ষণ, গরিব আদিবাসীদের জমি গ্রহণ ও সন্ত্রাসের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। এ অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে একমাত্র জনগণ। স্বচ্ছ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে।

—**রবীন্দ্রনাথ রায়,**
সাহেবের হাট, কোচবিহার।

জয় বাংলা? সে তো মুখের কথা!

ওরা মুখে জয় বাংলা বলে। বাঙ্গলা মানে জানে? জানে না। বাঙ্গলাকে প্রাচীন শাক্তশাস্ত্রে মা কালীর সাক্ষাৎ রূপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাঙ্গলা অর্থাৎ এই বঙ্গভূমি আর মা কালী এক ও সমার্থক। যারা বাঙ্গালির মান ইজ্জত বেজাতি বিধর্মী অসুর দানব দৈত্যদের হাতে তুলে দেয়, যারা পশ্চিমবঙ্গের সম্পদ বিকিয়ে বাঙ্গালির মা-বোন স্ত্রী কন্যাকে বিদেশির ভোগ্যপণ্য হতে বাধ্য করে, যারা গুণ্ডা বদমাশ পুলিশ দিয়ে প্রতিবাদীদের খুন করায়, যারা বাঙ্গলাকে ধনেপ্রাণে শেষ করে নিজেদের ফূর্তির ফোয়ারা ওড়ায় তারা চোখে 'জয় বাংলা' আক্রান্ত হয়ে বা সেই ধ্বনি উচ্চারণ করে পার পাবে না। পাপীরা যুগে যুগেই দেবতাদের মন্ত্রজপ করে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের বর পায় কিন্তু তাতে কী? পাপের ঘড়া পূর্ণ হলে হিরণ্যকশিপু মহিষাসুর রাবণ শিশুপাল কংস জরাসন্ধ সবাইকেই নৃশংস ভাবে ধ্বংস হতে হয়েছিল। মহাকাল ভক্তকে ক্ষমা করেন কিন্তু যে পাপীরা মহাকালের ভক্তিকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। তেমনি আজ যারা জয়বাংলা জয়ভারত যা খুশি বলছে আর দেশ ধর্ম সংস্কৃতি মা- বোন-স্ত্রী-কন্যা দিদি-বউদি মাসি পিসিকে বেচে দিচ্ছে, তারা মহাকালের বিচারে নৃশংস মৃত্যুদণ্ড পাবেই পাবে। বাঙ্গালিকেও লড়াই চালিয়ে যেতে হবে সত্যের পক্ষে, অন্যথায় অনন্ত নরকপ্রাপ্তি আমাদেরও হবে।

—**অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়,**
নিমতা, উত্তর ২৪ পরগনা।

টবে রাখা কলাগাছ, বেলগাছ দিয়ে পূজামণ্ডপ সাজানো হোক

দুর্গাপূজা সমেত নানান পূজার্চনায়, নানান মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে, উৎসবে, বিবাহে প্রবেশ দ্বারের পাশে, মন্দিরের প্রবেশপথে, মণ্ডপে-প্রতিমার কাছে কাটা কলাগাছের উপকাণ্ড এনে সাজানো হয়। দুর্গাপূজার বোধনে বিল্ববৃক্ষের শুকনো ডাল রাখা হয়। তা অল্পসময়ের মধ্যে প্রাণহীন, শুষ্ক হয়ে যায়। সুন্দর সাজসজ্জার মাঝে বেমানান লাগে এইগুলি। এইভাবে কলার চারাও নষ্ট হয় প্রচুর। এই চারাগুলি ফুল-ফল দিতে পারতো। বেলের ডাল এভাবে অকারণে বিনষ্ট হয়।

এই গাছগুলিই যদি যত্ন করে টবে লালন-পালন করেন নার্সারীম্যান অথবা ফুলমালী উৎসবের দিনগুলিতে বিক্রি করেন, তাদের বেশ কিছুটা আয় হতে পারে। মাঝারি কিংবা বড়ো টবে রোপণ করা কলাগাছের চারা বা বেঁটেজাতের (যেমন গ্র্যান্ড নাইন) ফলন্ত গাছগুলি কম করে তিন চারশো টাকায় বিকোতে পারে। এমনকী তার চেয়েও বেশি দাম পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। পুজোর পর তা মানস-ভাসান দিয়ে উদ্যোক্তাদের কাউকে কাউকে উপহার দেওয়া যেতে পারে। একফালি জমি থাকলে সেখানে গাছগুলি লাগিয়েও দেওয়া যায়।

বোধনের সময় বেলগাছের বড়ো ডালগুলি ভেঙে না এনে, বেলগাছের কলমের চারা টবে রোপণ করে পূজায় দশকর্মার দোকানে বিক্রি করা যেতে পারে। বারোয়ারি পুজোর নামে গাছপালা লণ্ডভণ্ড করা ঠিক নয়। আগে যেখানে পূজা হতো, যে মন্দিরে, যে গৃহে, তার পাশে রোপণ করাই থাকতো বেলগাছ, প্রবেশপথে কলাগাছের সম্ভার, পুজোর কাজে লাগানো তুলসীর কেয়ারি ও তুলসীমঞ্চ, নীলকণ্ঠ-অপরাজিতা-অতসী-জবা ইত্যাদির বাগান; কখনও মন্দির সন্নিহিত পুষ্করিণীতে পদ্ম।

টবে রক্ষিত কলা, বেল, তুলসী ইত্যাদির চাহিদা থাকলে নার্সারীম্যান বা দোকানদার সেই মতো গাছ তৈরি করবেন। সতেজ গাছ বিক্রি হবে। যারা পুজো উদ্বোধনে আসেন, তাদের ফুলের স্তবক না দিয়ে সুদৃশ্য টবে রাখা ফুলগাছ দিয়ে বরণ করুন। ফুল এবং গাছের অপচয় বন্ধ হোক।

পূজা সম্পন্ন হয়ে গেলে ব্যবহৃত বিপুল পরিমাণ ফুল-মালা-বেলপাতা ইত্যাদি পচনশীল দ্রব্য মণ্ডপ-সন্নিহিত স্থানে বড়ো গর্ত করে তা পচিয়ে জৈব সার তৈরি করে নিন, দূষণ বন্ধ করুন, পুজোর স্থান আবর্জনা মুক্ত রাখুন। এই বার্তা প্রচারের লক্ষ্যে সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ বিশেষ প্রয়োজন।

অরিত্র ঘোষ দস্তিদার,
বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,
মোহনপুর, নদীয়া।

With Best Compliments from -

A Well Wisher

ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

ডায়াবেটিস থাকলে এক নয়, একাধিক জটিল শারীরিক সমস্যা আসতে পারে। তাই একে সাইলেন্ট কিলার বলা হয়। বিশ্বজুড়ে আজ ডায়াবেটিস নিঃশব্দ ঘাতকের মতো থাবা বসাচ্ছে। দীর্ঘদিন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তির হার্ট, চোখ এবং কিডনি সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রথম থেকেই সুগার নিয়ন্ত্রণে না থাকলে হতে পারে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি। যা একটি জটিল চোখের অসুখ। টাইপ ১ এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিস— এই দুইয়ের ক্ষেত্রেই আসতে পারে এই ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি। যাঁদের পারিবারিক ইতিহাসে সুগার রয়েছে বা দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিসে ভুগছেন তাঁদেরই এই রোগের সম্ভাবনা বেশি।

ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি কখন হয়

ডায়াবেটিস যদি দীর্ঘদিন ধরে থাকে তাহলে রেটিনার ওপর ক্রমাগত চাপ পড়ে। ফলে রেটিনার রক্তনালিগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রেটিনা হলো আপনার চোখের পিছনের টিস্যুর একটি স্তর, যা চোখ যে চিত্রগুলি দেখে সেগুলিকে স্নায়ু সংকেতে পরিবর্তন করতে সাহায্য করে। যাতে মস্তিষ্ক সেগুলি বুঝতে পারে। চোখের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্নায়ুর সঙ্গে যোগ থাকে রেটিনার সঙ্গে। আমাদের দৃষ্টিজাত ইমেজ তৈরি হয় এই রেটিনায়।

যখন এই রেটিনার রক্তনালিগুলি কোনও ক্ষতির সম্মুখীন হয়, এই রক্তনালি ব্লক হয়ে যেতে পারে। ফলে রেটিনায় রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে রক্তপ্রবাহের ক্ষতি হয়ে কিছু অস্বাভাবিক রক্তনালি তৈরি হয় এবং বৃদ্ধি পায়। এই নতুন রক্তনালিগুলো ফুটো হতে পারে এবং তার ফলে ছোটো-ছোটো সাদা ছোপ (ইডিমা) পড়ে, তখন স্পষ্ট ইমেজ তৈরি হয় না। দৃষ্টিশক্তি ঘোলাটে হয়ে যায়। যে কারণে দৃষ্টিশক্তি হারাতে পারেন রোগী। এই সমস্যাই হলো ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি। যত দিন গড়ায় ধমনীতে রক্ত চলাচলের সমস্যা আরও বাড়ে এবং রেটিনার বিভিন্ন অংশে ঠিকমতো অক্সিজেন পৌঁছায় না। তখন সেই কাজটি করে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য নালি। কিন্তু তারাও রেটিনার নানা স্থানে রক্ত পৌঁছে দিতে ব্যর্থ হয়। এই দুর্বল নালি ফেটে চোখে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। চিকিৎসার পরিভাষায় একে বলে ভিট্রিয়াস হেমারেজ। এগুলো সবটাই ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথির জটিল পর্যায়। একে চিকিৎসার পরিভাষায় প্রলিফারেটিভ রেটিনোপ্যাথিও বলে। এর থেকে আজীবন অন্ধত্ব আসতে পারে।

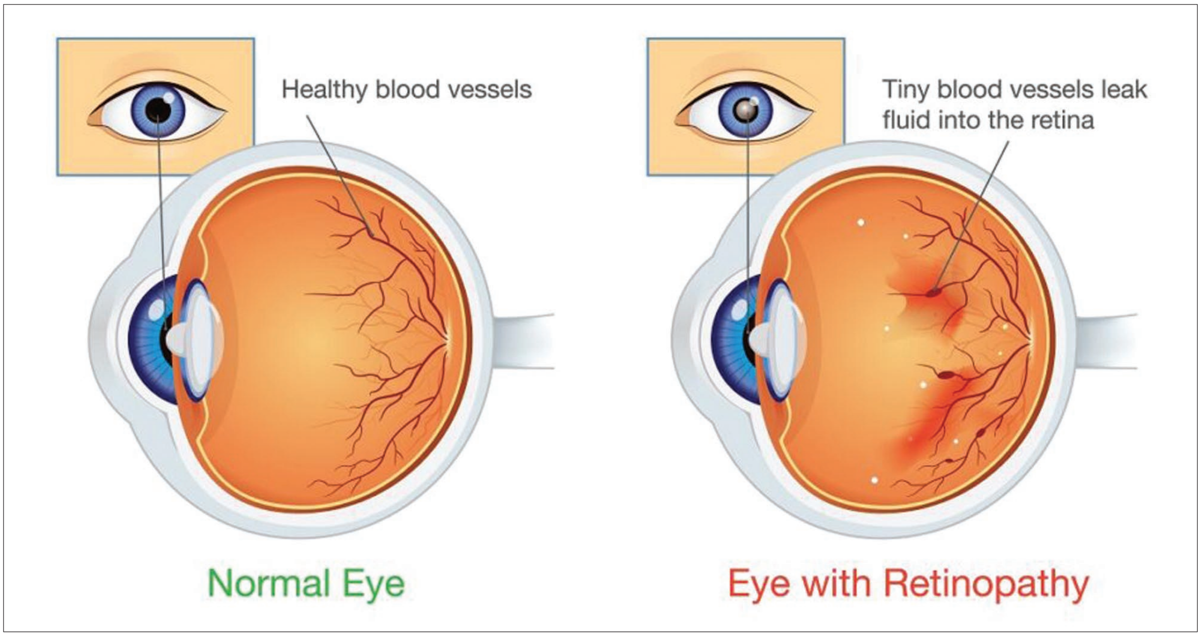

ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি প্রথম অবস্থায় অতটা বোঝা যায় না। সাধারণত হালকা দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায় কারও কারও। তবে ঠিক সময় ধরা না পড়লে দৃষ্টিশক্তি হরানোর প্রবল

সম্ভাবনা থাকে।

যদিও শুধু ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি নয়, ডায়াবেটিসের রোগীদের চোখে নানা ধরনের কমপ্লিকেশন হতে পারে। চোখের মধ্যে যে ল্যাক্রাইমাল গ্রন্থি থাকে, তার ক্ষরণ কমে গেলে সেখান থেকে শুষ্কতার সমস্যা তৈরি হয়। এই শুষ্কতা যদি দীর্ঘদিন থাকে তখন ক্যাটারাক্ট হয় বা চোখে ছানি পড়ে। ছানি পড়লে অস্ত্রোপচার ছাড়া গতি থাকে না।

ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি টাইপ ১ এবং টাইপ ২ দুই ধরনের ডায়াবেটিসেই আসতে পারে। টাইপ ২ ডায়াবেটিসে এটা তুলনায় পরে আসে কিন্তু টাইপ ১ ডায়াবেটিস জিনগত কারণে এবং অনেক কম বয়সেই হয়। তাই ডায়াবেটিসের একটা দীর্ঘ ইতিহাস এদের থাকে। ফলে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথির সম্ভাবনা এদের অনেক বেশি।

রেটিনোপ্যাথি চিনবেন কীভাবে

- এই রোগে চোখের সামনে পোকা ঘুরে বেড়াচ্ছে মনে হবে।
- ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি কমতে থাকে।
- কিছু পড়তে বা দূরের জিনিস দেখতে অসুবিধা হয়।
- দৃষ্টির মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেয়।
- আই ফ্লোটার বা চোখের দৃষ্টিতে গাঢ় দাগ দেখা যায়।
- রাতে দেখতে বেশ অসুবিধে হয়।
- রং আলাদা করতে অসুবিধে হয়।
- পরবর্তীকালে দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

এই ধরনের উপসর্গ দেখলেই দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। এক্ষেত্রে চিকিৎসকেরা সাধারণত বেশ কয়েকটি পরীক্ষা করান। এগুলির মধ্যে রয়েছে অ্যাঞ্জিওগ্রাফি, চোখের স্ক্যান।

কখন ঝুঁকি বাড়ে

- যাঁরা ডায়াবেটিসকে পাত্তা দেন না, অবহেলা করেন বা নিয়ম মেনে চলেন না, তাঁদের ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
- হাই ব্লাড প্রেশার, হাই কোলেস্টেরল থাকলে এই রোগের ঝুঁকি বাড়ে।
- ডায়াবেটিস রোগীর শরীরে অত্যধিক চর্বি জমলে, কোনও শারীরিক কসরত বা ব্যায়াম না করলে বা সারাক্ষণ শুয়ে বসে থাকলে এই রোগের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।
- গর্ভবতী মহিলার রেটিনোপ্যাথি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।
- নিয়মিত ধূমপান করেন যাঁরা তাঁদের ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথির সম্ভাবনা রয়েছে।

কী কী পরীক্ষা করা যেতে পারে

ফ্লুয়োরেসিন অ্যাঞ্জিওগ্রাফি টেস্ট :

এই পরীক্ষায় রোগীকে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। এই পরীক্ষা মাধ্যমে লিক হওয়া রক্তনালিগুলোতে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে।

অপটিক্যাল কোহেরেন্স টোমোগ্রাফি :

এটির সাহায্যে চিকিৎসক রেটিনার টিস্যুতে কতটা তরল লিক হয়েছে তা নির্ধারণ করতে পারে।

এই সব টেস্টের পর ইঞ্জেকশন, লেজার ট্রিটমেন্ট এবং ভিট্রেক্টমির ইত্যাদি চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে। লেজার থেরাপি, চোখের ইঞ্জেকশন বা স্টেরয়েড ইঞ্জেকশন দিয়ে দৃষ্টিশক্তি আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়।

ইঞ্জেকশন :

ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি চিকিৎসায় দু'ধরনের ওষুধ রয়েছে যা ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে দেওয়া হয় এই ইঞ্জেকশনগুলি রেটিনায় অস্বাভাবিক রক্তনালিগুলির বৃদ্ধিকে ধীর করতে সাহায্য করে।

লেজার ট্রিটমেন্ট :

এই পদ্ধতি ফটোকোয়াগুলেশন নামেও পরিচিত। এই পদ্ধতির মাধ্যমে রেটিনায় অস্বাভাবিকভাবে ক্রমবর্ধমান রক্তনালিকাগুলিকে কমিয়ে দেওয়া হয়।

ভিট্রেক্টমি :

এটি একটি অস্ত্রোপচার পদ্ধতি যা একটি ছোট্ট ফুটো করে রেটিনা এবং ভিট্রিয়াস থেকে রক্ত এবং দাগের টিস্যুগুলো সরিয়ে ফেলা হয়।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে

শুধু চোখ নয়, শরীরের যে কোনও অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সুরক্ষিত রাখতে ডায়াবেটিসকে রোখা দরকার। যাঁদের ডায়াবেটিস রয়েছে, তাঁদের খাওয়াদাওয়ার দিকে নজর দেওয়া জরুরি। কারণ শুধু ঠিকঠাক ডায়েটে আপনি ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন। দু'ধরনের কার্বোহাইড্রেট রয়েছে। প্রথমটি, চাল এবং চিনির মতো সাধারণ কার্বোহাইড্রেট যা আমাদের দেহে দ্রুত ভেঙে যায় এবং দ্রুত শক্তি দেয়। দ্বিতীয়, কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট, যেমন গম, ভাঙতে বেশি সময় নেয় এবং ধীরে ধীরে আমাদের শক্তি দেয়। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে এই কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট যুক্ত খাবার খেতে হবে। জল খেতে হবে পর্যাপ্ত। প্রতিবার ইউরিনের মাধ্যমে শরীরের অতিরিক্ত গ্লুকোজ বেরিয়ে যায়।

দেখতে হবে ওজন যেন সবসময় নিয়ন্ত্রণে থাকে। এক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি ফলপ্রসূ। □

কৃষি দেবতা শিব

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

কৈলাস ছেড়ে মা দুর্গা মর্ত্যধামে এসে সাময়িক আশ্রয় নেন পৃথিবীতে ‘শিবের ফ্ল্যাটবাড়ি’তে; সেটা হলো বিল্ববৃক্ষ। দুর্গাপূজার বোধনে সায়ংকালে সেই বেলগাছের সামনে গিয়ে বিল্বতরুকে আহ্বান করা হয়— ‘ওঁ মেরুমন্দর-কৈলাস-হিমবচ্ছিখরে গিরৌ। জাতঃ শ্রীফলবৃক্ষ ত্বমম্বিকায়াঃ সদা প্রিয়ঃ। শ্রীশৈলশিখরে জাতঃ শ্রীফলঃ শ্রীনিকেতনঃ। নেতব্যোহসি ময়গচ্ছ পুজ্যো দুর্গাস্বরূপতঃ।।’ শিবের সঙ্গে বিল্ববৃক্ষের যোগ বৃক্ষ পূজার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

একটি প্রচল কথা হলো : ‘ধান ভানতে শিবের গীত।’ শিব কৃষি দেবতা বলেই ফসল পাবার পর ধান ভানার অবসরে শিবকে ধন্যবাদ জানাতে ভোলে না লোকসমাজ। ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ শতকের বাংলা সাহিত্যে রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ; কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ রায় এবং রামেশ্বর ভট্টাচার্য রচিত ‘শিবায়ন’-এ শিব কৃষকরূপে কল্পিত।

শূন্যপুরাণে শিব সম্পর্কিত একটি ছড়া ভগিনী নিবেদিতাকে দেখিয়েছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন। নিবেদিতা বলছেন, ‘ও দীনেশবাবু, এটা একটা আশ্চর্য জিনিস!’ ভগিনী নিবেদিতা গ্রাম্য-কাব্যের মধ্যে ভারতীয় ভাবের অতুলনীয়তা দেখে আশ্চর্য হলেন। শিবের দুঃখে কাতর তার ভক্ত, ভুলে গেছেন নিজের দুঃখও; তাঁকে পরামর্শ দিচ্ছেন চাষ করার।

‘আহ্মর বচনে গোসাঞি তুহ্মি চষ চাস।
কখন অন্ন হএ গোসাঞি কখন উপবাস।’

শিবকে ভিক্ষে করে খেতে হয়, এ বড়ো বিড়ম্বনা; ভিক্ষা করে কোনোদিন কিছু জোটে আবার কোনোদিন নিরম্বু উপবাস। তার চেয়ে শিব বরং ধান চাষ করুন, ধান ভানুন, শিবের কষ্ট দূর হবে—

‘ঘরে ধান্ন থাকিলেক পরভু সুখে অন্ন খাব।
অন্নর বিহনে পরভু কত দুঃখ পাব।।’

শিব প্রায় উলঙ্গ, তাকে বাঘছাল পরে কাটাতে হয়; তার চেয়ে বরং শিব কাপাস বুনুন, তুলো থেকে সুতো করে কাপড় বুনুন; তবে শিব সুখী হবেন।

ভক্ত তার আরাধ্যকে আরও উপদেশ দিচ্ছে—

‘সকল চাষ চস পরভু আর রুইও কলা।
সকল দব্ব পাই জেন ধম্মপূজার বেলা।’

শিবায়ন কাব্যে চাষের সজ্জা, বীজধান সংগ্রহ, শিবের চাষের জমিতে যাত্রা, ফসলোৎপাদন অংশের বর্ণনা আছে।

‘দিন সাত বরষিয়া দিলেক ঈশানে।
হৈল হাল-প্রবাহে শিবের শুভক্ষণে।

বাঙ্গালি জীবনে বাঙ্গালির কাছে শিব যত না দেবতা, তার চাইতেও সে আপন পরিবারের এক সদস্য। একটি ছড়ায় তিনি জামাই হয়ে চিত্রকল্প রচনা করিয়ে দিয়েছেন লোককবিকে। আর তারই সুবাদে ছড়ার স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় গ্রামীণ জীবনে জামাই- আদরের ঝলক

‘শিব গেল শ্বশুরবাড়ি, বসতে দিল পিঁড়ে।
জলপান করতে দিল শালিধানের চিঁড়ে।
শালিধানের চিঁড়ে নয় রে, বিন্নিধানের খই।
মোটা মোটা সবরি কলা,
কাগমারী দই।’

শালিধানের চিঁড়ে, বিন্নিধানের খই, সবরি কলা আর কাগমারী দই দিয়ে শিব-কে ফলাহার দিয়েছেন শ্বশুর বাড়ির লোকজন। শিব এসেছেন কোথা থেকে, না গঙ্গার মাঝে জেগে ওঠা চর থেকে। দু’পাশে দুই জলধারার মাঝে জেগে উঠেছে মাঝের চর। পলিমাটি অধ্যুষিত বিস্তীর্ণ ভূমিতে হয়তো তিনি চাষাবাদ করেন। আর শিব যে কৃষি দেবতা তার প্রমাণ ‘ধান ভানতে শিবের গীত’ প্রবাদের মধ্যে। আরেকটি ছড়ায় দেখা যায় শিব ঠাকুরের বিয়ের কথা, ‘বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর/নদে এলো বান,/শিব ঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যা দান।’ অনুমান করে নেওয়া যায়, চরের জমিতে বোরোধান চাষ করা যায়, আউশধানও। কিন্তু বর্ষার বান এলে চাষাবাদের পালা গুটিয়ে নিতে হয়।

সাধারণ যাযাবর কৃষকের মতোই তিনি চরের অস্থায়ী ঠিকানা ছেড়ে এ কয় মাস গ্রামীণ জীবনে উঠে আসেন, আবারও অস্থায়ী ঠিকানা গড়ে ওঠে। বিয়ের পিঁড়িতে বসেন তিনি। কৌলীন্য প্রথায় জামাই বাড়ন্ত। কৃষক শিবকেই তাই তিন কন্যা বিয়ে করে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার দায়ভার মুক্ত করতে হয়। আর তখনই তিনি দেবতা না হয়ে গ্রামীণ মানুষের সুখ দুঃখের নিত্য সঙ্গী হয়ে যান। দেবতাকে এত কাছের করে নিতে পারেন আর কে আছেন! ■

কাশীর স্বর্ণমন্দিরে

নন্দলাল ভট্টাচার্য

অবিমুক্তক্ষেত্র কাশী :

শিবক্ষেত্র কাশী-বারাণসী। পবিত্র সপ্তপুরীর অন্যতম কাশী। ভারতের অধ্যাত্মসাধনার হীরকসম উজ্জ্বল বিন্দু এই হিরণ্যপুরী কাশী। বিশ্বেশ্বর বিশ্বনাথের বিরাজভূমি। মৎস্য পুরাণের মতে কাশী হলো অবিমুক্তক্ষেত্র। নিত্যস্বরূপ মোক্ষদাতা আশুতোষ শিব কখনও ত্যাগ করেন না এই শিবভূমি। পুরাণ-বচন— বিমুক্ত ন ময়া যস্মন্মোক্ষ্যতে বা কদাচন।/মহৎ ক্ষেত্র মিদং তস্মাদ বিমুক্ত মিদং স্মৃতম্। —মগ্নচৈতন্যের শুভ্র উদ্ভাস এই কাশী— সর্ব পুণ্যময়ী।

সুবর্ণপুরী কাশী। উত্তর ভারতের আরেক স্বর্ণমন্দির কাশী বিশ্বনাথের মন্দির। সুদূর অতীতে এই মন্দিরের নাম ছিল মোক্ষ লক্ষ্মীবিলাস। মৃত্যুঞ্জয়ী শিবের ধাম কাশী এই নরলোকের মোক্ষধাম। লোকবিশ্বাস, কাশীতে মৃত্যু হলে ঘটে মোক্ষলাভ। মানুষ হয় জন্ম-মরণ রহিত। মরণ সময় স্বয়ং কাশীশ শিব কানে শোনান শিবনাম। আর তাতেই হয় সমস্ত জাগতিক বন্ধনের অবসান।

কাশী ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত বা প্রদেশ থেকে আসা লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী শিববন্দনায় শিবতীর্থ কাশীর প্রতিটি মুহূর্ত হয়ে ওঠে পুণ্যময়, মন্ত্রময়। পুণ্যার্থী ভক্তজনরা তীর্থপতি বিশ্বনাথের মাথায় গঙ্গাবারি ঢেলে হন কৃতকৃতার্থ।

শাস্ত্রমতে, দেবাদিদেব মহাদেবকে তুষ্ট করার পথ হলো শিবলিঙ্গে নিয়মিত জলদান, দুগ্ধাভিষেক ইত্যাদি। শিবলিঙ্গ হলো আশুতোষ বিশ্বনাথ শিবের প্রতীক। সারা দেশে রয়েছে অসংখ্য শিবলিঙ্গ। তার কোনোটি স্বয়ম্ভু অর্থাৎ তার কোনো নির্মাতা নেই, আপনাআপই প্রকট হয়েছে তা। আবার কিছু শিবলিঙ্গ মানব নির্মিত।

অনন্তের প্রতীক :

শাস্ত্রমতে, শিবলিঙ্গের অর্থ হলো অসীম-অনন্ত। অর্থাৎ তাঁর কোনো আদি নেই, অন্তও নেই। শিবলিঙ্গ প্রকৃত অর্থে পুরুষ ও প্রকৃতি— শিব ও পার্বতীর অনাদি-আদি একক রূপ। শিবলিঙ্গ পুরুষ ও প্রকৃতির যুগলমূর্তি— সাম্যের এক অপরূপ প্রতীক।

শিব-পার্বতীর বিয়ে

শিবলিঙ্গ হলো এই সমাজের একটি সার্থক— সুন্দর প্রতীকী রূপ। সমাজে স্ত্রী অথবা পুরুষ কেউ-ই যে একা প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, এ কথারই এক মূর্ত প্রকাশ— শিবলিঙ্গ।

শিবলিঙ্গেরই একটি প্রকাশ এই জ্যোতির্লিঙ্গ। জ্যোতির্লিঙ্গ দেবাদিদেব শিবের জ্যোতি বা আলোকবর্ষী রূপে প্রকট হওয়ার একটি নিদর্শন। জ্যোতির্লিঙ্গ মানবনির্মিত নয়। এই লিঙ্গ স্বয়ম্ভু। সৃষ্টির কল্যাণ ও গতিশীলতা বজায় রাখার জন্যই জ্যোতির্লিঙ্গের আবির্ভাব।

হিন্দুর ঘরে অথবা মন্দিরে রয়েছে অসংখ্য শিবলিঙ্গ। কিন্তু তার মধ্যে জ্যোতির্লিঙ্গের সংখ্যা মাত্র বারো। অবশ্য কিছু কিছু পুরাণে জ্যোতির্লিঙ্গের সংখ্যা ৬৪ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে তার মধ্যে বারোটি পরম শুভ ও কল্যাণদায়ক। বিশ্বাস, যেখানে যেখানে রয়েছে জ্যোতির্লিঙ্গ, সেখানেই শিব বিরাজিত এক আলোকরশ্মি বা শত সহস্র সূর্যের মতো দীপ্ত এক তেজ বা রশ্মি রূপে। এই জ্যোতির্লিঙ্গের কারণে পৃথিবী এখনও গতিশীল। এ কারণেই মর্ত্যবাসীর জীবন সদা সঞ্চরণশীল— গতিময়।

দ্বিতীয় কৈলাসের অন্নদাত্রী :

ভারতে এখনও পূজিত হচ্ছে যে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ, তার প্রথমটি হলো কাশী। বিভিন্ন শিবপুরাণে আছে এমন কথাই। কাশী হলো দ্বিতীয় কৈলাস। এখানে রয়েছেন শিব-পার্বতী বাবা বিশ্বনাথ এবং মাতা অন্নপূর্ণা রূপে। মোক্ষতীর্থ কাশীতে বিশ্বেশ্বর মানুষকে দেন মুক্তি, আর মাতা অন্নপূর্ণা সকলকে জোগান অন্ন। কাশীতে কেউ কখনো অভুক্ত থাকে না। যুগে যুগে ভক্তজন লালিত এই বিশ্বাসেই।

সেই বিশ্বাস যাচাই করার বাসনা জাগে আধুনিক ভারতের অন্যতম সাধক শ্রেষ্ঠ নিগমানন্দ সরস্বতীর মনে। কাশীতে এসে তাঁর মনে জাগল প্রশ্ন, সত্যিই কি মাতা অন্নপূর্ণা অভুক্ত রাখেন না কাউকে। এ কি কেবলই লোকবিশ্বাস? নাকি এর পেছনে রয়েছে কোনো সত্য। সেই সত্য জানতেই গঙ্গাতীরে নিরম্বু উপবাসে ধ্যানস্থ হলেন স্বামী নিগমানন্দ।

সামনে প্রবাহিত গঙ্গার মতোই কেটে যায় সময়। নিগমানন্দ মগ্ন ধ্যানানন্দে। সেই সঙ্গে সক্রিয় এক সত্যকে পূর্ণভাবে অনুধাবনের জন্য। সূর্য তখন পশ্চিমাকাশে রাত্রির আগমন প্রতীক্ষায়। নিগমানন্দ তখনও রয়েছেন অনাহারেই। হৃদয় তখনও বিক্ষত এক প্রশ্ন-যন্ত্রণায়। কই, এখনও তো এলো না কেউ। তাহলে কি সত্য নয় সে কথা। সবই কি কেবলই কাহিনি?

এমনই ভাবনায় অস্থির যখন নিগমানন্দ, সেই সময় ঘাটে আসেন এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধা। স্নানের জন্য। বৃদ্ধ নিগমানন্দের কাছে এসে বলেন, আমার এই পুঁটলিটি একটু দেখবে বাবা! আমি স্নান সেরেই নিয়ে যাবো। ইঙ্গিতে সম্মতি জানান নিগমানন্দ। বৃদ্ধাও কাপড়ে জড়ানো একটা ছোট্ট পোঁটলা রেখে যান স্নান করতে।

কেটেছে যে কত সময়, সে খেয়াল নেই নিগমানন্দর। মিলিয়ে গেছে গোধূলির আলো। রাতের অন্ধকার গাঢ়। স্নানার্থী আর কেউ নেই ঘাটে। নির্জন সেই সময় শোনা যায় কেবল গঙ্গার কুলুকুলু ধ্বনি। অকস্মাৎ যেন চমক ভাঙে নিগমানন্দের। তাকিয়ে দেখেন, পাশে রয়েছে বৃদ্ধার সেই পোঁটলা। তাকিয়ে দেখেন নির্জন ঘাটে নেই কেউ। নেই সেই বৃদ্ধা। তাই কেবল অপেক্ষা। গভীর হয় রাত্রি। আসন ছাড়েন নিগমানন্দ। বৃদ্ধার পুঁটলিটা নিয়ে কী করবেন তা বুঝতে পারেন না। নেহাতই কৌতূহলের বশে পুঁটলি খুলে দেখেন তাতে রয়েছে মিষ্টি খাবার। তখনও তপ্ত।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা। শেষে কী ভেবে সেই খাবার খেয়ে ফিরে যান আবাসে। রাতে স্বপ্ন— মা অন্নপূর্ণা দেখা দিয়ে বলেন, কি, এবার বিশ্বাস হলো তো? দেখলে তো অভুক্ত থাকে না কেউ কাশীতে।

ঘুম ভাঙে নিগমানন্দের। বোঝেন সেই পরম সত্যকে। মুখর হন মাতৃবন্দনায়।

এক ভক্তিমূলক উপস্থাপনা :

আবির্ভূত তিনি জ্যোতির্লিঙ্গ রূপে। সৃষ্টির মূলে রয়েছেন যে পরম নিরাকার নির্গুণ শক্তি— তারই বাস্তব প্রতীক এই প্রাচীন অক্ষমুক্তি প্রতীক এই জ্যোতির্লিঙ্গ। নির্গুণ শক্তি বা শিবের সগুণ রূপ এই জ্যোতির্লিঙ্গ।

জ্যোতির্লিঙ্গ বা আলোর লিঙ্গমূর্তি হলো শিবের ভক্তিমূলক উপস্থাপনা। জ্যোতিস্ বা তেজ এবং লিঙ্গ বা চিহ্নর সংস্কৃত যৌগ শব্দ জ্যোতির্লিঙ্গ। শিব মহাপুরাণে আছে ৬৪টি মূল জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দির। তার মধ্যে বারোটি পরম শুভ এবং 'আত্মপ্রকাশিত' এই বারোটি হলো মহাজ্যোতির্লিঙ্গ। তাদের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন নাম। প্রতিটি জ্যোতির্লিঙ্গ শিবেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশের এক একটি রূপ। জ্যোতির্লিঙ্গ আধ্যাত্মিক রূপ দর্শনকে বলা হয়। এটি হলো একটি আদি অন্তহীন আলোক স্তম্ভ। এই আলোক স্তম্ভ হলো শিবের অসীম শক্তির প্রতীক। এই বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দিরের মধ্যে আদি বা প্রথমটি হলো কাশী বা বারাণসীর বিশ্বেশ্বর বা বাবা বিশ্বনাথের মন্দির। মহিমা বা প্রভাবে যা কেবল ভারত নয়, বিশ্বের সমস্ত অধ্যাত্মপিপাসু মানুষের পরম শান্তির এক অখণ্ড রূপ।

উদ্ভব-কাহিনি :

এই মরজগতের মানুষের মুক্তি বা মোক্ষের অনন্ততীর্থের অধিদেবতা হিসেবে জ্যোতির্লিঙ্গের আবির্ভাব সম্পর্কে

শিবপুরাণগুলিতে রয়েছে অপূর্ব এক কাহিনি।

সৃষ্টির সেই এক পরম মুহূর্তে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা আর স্থিতি নায়ক বিষ্ণু জড়িয়ে পড়লেন এক কূটবিবাদে। অহমিকা গ্রাস করল দু'জনের হৃদয়কেই। সেই তামস প্রভাবে, দু'জনেরই দাবি,— তিনিই শ্রেষ্ঠ, তিনিই এই সৃষ্টির মূল কারণ।

বিতর্কে মুখর ব্রহ্মা ও বিষ্ণু। দু'জনেই নিজের নিজের সিদ্ধান্তে অটল। ফলে মীমাংসার কোনো আলোই দেখা যায় না কোনো দিকে। তাঁদের ওই বিবাদের কারণে সৃষ্টির সরণিও যেন কোনো এক গভীর খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে। সব বুঝি কিছু অচল হওয়ার ইঙ্গিত তখন প্রকৃতিতে। বুঝি-বা দূরে বেজে ওঠে লয়ের বাঁশরি।

সৃষ্টির সেই সংকট মুহূর্তে আবির্ভূত হন সংহারকর্তা শিব। ত্রিভুবন ভেদ করে আবির্ভূত হন তিনি এক সুবিশাল অন্তহীন আলোকস্তম্ভ রূপে। তাঁরই ইঙ্গিতে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু সক্রিয় হন সেই আলোকস্তম্ভের শুরু ও শেষের উৎসসন্ধানে। হংসাসীন ব্রহ্মা সেই আলোকস্তম্ভের শেষসীমা দেখার জন্য হন ঊর্ধ্বমুখী আর বরাহ রূপ নিয়ে বিষ্ণু সেই স্তম্ভের উৎস বা উদ্ভব ভূমিটি দেখার জন্য হন নিম্নমুখী।

সে এক অন্তহীন অনুসন্ধান। আরোহণ ও অবরোহণের সে এক আশ্চর্য অভিযাত্রা।

বরাহরূপী বিষ্ণু নেমেই চলেছেন— নেমেই চলেছেন। সে এক অন্তহীন পথ চলা। কত যে সময় তার হিসেব রাখেনি কেউ। চলতে চলতে এক সময় ক্লান্ত হন বিষ্ণু। তবুও সেই আলোকস্তম্ভের উৎসে পৌঁছতে পারেন না। অবশেষে অবসন্ন বিষ্ণু বিরতির রেখা টানেন অন্বেষণে। ফিরে আসেন আবার যাত্রাশুরুর কেন্দ্রেই।

একইভাবে হংসাসীন ব্রহ্মাও চলেছেন ঊর্ধ্বপথে— বিষ্ণুর মতোই অবিরাম গতিতে। ক্লান্তি গ্রাস করে তাঁকেও। তিনিও ফিরে আসেন সেই আগের জায়গাতেই। ফিরে আসার পথেই ব্রহ্মা ঠিক করেন, মিথ্যে বললেন তিনি। আর সে কারণেই আরোহণের পথে ওপর থেকে খসে পড়া কেতকী ফুলকে তাঁর হয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য প্রলোভিত করেন।

বিষ্ণু অকপট ভাবেই তাঁর পরাজয়ের কথা স্বীকার করেন। কিন্তু ব্রহ্মা কেতকী ফুলকে সাক্ষী রেখে বলেন, তিনি পৌঁছেছিলেন আলোকস্তম্ভের শেষ সীমায়।

ব্রহ্মার এই মিথ্যাভাষণের সঙ্গে সঙ্গে সেই আলোকস্তম্ভ ভেদ করে আবির্ভূত হন শিব। রুদ্রমূর্তি তিনি। ব্রহ্মার মিথ্যাভাষণে ক্রুদ্ধ তিনি ছিন্ন করেন ব্রহ্মার পঞ্চম মুণ্ডটি। অভিশাপ দেন, কোনো অনুষ্ঠানেই পূজিত হবেন না তিনি। আর মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য কেতকী ফুলকেও অভিশপ্ত করেন। বলেন, কোনো পুজোতেই লাগবে না এই ফুল। অন্যদিকে সত্য ভাষণের জন্য বিষ্ণুকে আশীর্বাদ করে বলেন, সৃষ্টির অন্তিমকাল পর্যন্ত পূজিত হবেন তিনি।

অখণ্ড সর্বোচ্চ সত্যের প্রতীক হলেন শিব নিজে। হিন্দু বিশ্বাস অনুসারে, জ্যোতির্লিঙ্গ শিব হলেন অগ্নিময় আলোকস্তম্ভ। আবির্ভূত হন তিনি আর্দ্রা ক্ষেত্রে। স্কন্দ পুরাণের কাশীখণ্ডে আছে কৈলাশের পর মর্ত্যে শিব-পার্বতীর আপন ভূমি হলো বারাণসী।

বিধ্বংস বারে বারে :

মন্দির নগরী কাশী বা বারাণসী। স্কন্দ পুরাণের কাশীখণ্ডের তথ্য, কাশীতে রয়েছে ১০৯৯টি মন্দির। এর প্রায় অর্ধেক ৫১৩টি মন্দিরেরই অধিদেবতা শিব। তাই কাশীকে বলা হয় শিবালয়ও।

কাশীর ৫১৩টি শিবমন্দিরের প্রধান যা মুখ্য দেবালয়টি হলো আদি বিশ্বনাথ যা বিশ্বেশ্বর মন্দির। ঠিক কবে কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এ মন্দির তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে কাশীখণ্ডে এই মন্দিরের উল্লেখ থাকায় অনুমান করা যায়, প্রথম মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল সেই পৌরাণিক যুগে।

বয়ে গেছে সময়। বয়ে গেছে বারাণসীর গঙ্গার পূত বারিপ্রবাহ। সেই সঙ্গে কালের স্পর্শে অথবা অন্য কোনো কারণে সেই আদি মন্দির বিনষ্ট হয়েছে, আবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তা বিনির্মিতও হয়েছে। এই নির্মাণ ধারাতেই একাদশ শতকে হরিশচন্দ্র বিশ্বনাথ মন্দিরটি আবার তৈরি করান। এরপর প্রায় ন'শো বছর ধরে চলে ওই মন্দির ধ্বংস ও পুনর্গঠনের পালা।

বলা যায়, গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরের পর সম্ভবত কাশী ও বিশ্বনাথ মন্দির ইসলামি আক্রমণকারীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছে সবচেয়ে বেশি বার। মুসলমানদের আক্রমণে মন্দির ধ্বংসের ঘটনার শুরু বিগত দ্বাদশ শতকে।

মুহাম্মদ ঘোরি ১১৭৩ খ্রিস্টাব্দে গজনি শহরটি দখল করার পর শুরু করে ভারত অভিযান। সেটা ১১৭৫-৭৬ খ্রিস্টাব্দের কথা। ক্রমাগত ভারত আক্রমণের মধ্য দিয়ে কেরি চন্দওয়ারের যুদ্ধে কনৌজের রাজা জয়চন্দ্রকে পরাজিত করার পর ১১৯৪ খ্রিস্টাব্দে কাশী এবং সেখানকার মন্দিরগুলি ধ্বংস করে, কয়েক বছরের মধ্যে মন্দিরের জায়গায় নির্মিত হয় মসজিদ।

১২৩০ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সুলতান ইলতুৎমিসের রাজত্বকালে গুজরাটের এক বণিক আদি বিশ্বনাথের মন্দিরের অদূরে অবিমুক্তেশ্বর মন্দিরের কাছে নতুন মন্দিরটি তৈরি করেন। সুলতান হোসেনশাহ শার্কি সে মন্দিরটিও ধ্বংস করে।

ভাঙা-গড়ার এই পর্বে ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে মুঘলশাসক আকবরের রাজস্বমন্ত্রী টোডরমল আবার মন্দিরটি গড়ে তোলেন। অন্য মতে মন্দিরটি গড়েন রাজা মানসিংহ। আকবরের প্রপৌত্র ঔরঙ্গজেব ছিলেন এই ধ্বংস কাণ্ডের নায়ক। মন্দির ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হয়নি সে। মন্দিরের জায়গায় তৈরি করে জ্ঞানবাপী নামে একটি মসজিদ। কাশীর নামও বদলে রাখে মোহাম্মদাবাদ। জ্ঞানবাপী মসজিদের পেছনে আজও রয়েছে মন্দিরের ভগ্নাবশেষ, এমনই দাবি করা হয়।

মন্দির গড়েন অহল্যাবাই :

সময় এগিয়ে চলে। মরাঠা পেশোয়া বালাজী বাজীরাওয়ের অনুগত মলহার রাও হোলকর ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে মসজিদ ভেঙে মন্দির তৈরির পরিকল্পনা নেন। ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে একই উদ্দেশ্যে জয়পুরের মহারাজ মন্দিরের জন্য জমি জরিপের কাজ শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বনাথের বর্তমান মন্দিরটি তৈরি করেন মলহার রাও হোলকরের পুত্রবধূ ইন্দোরের

মহারানি অহল্যাবাই।

দশাশ্বমেধ ঘাটের অদূরে গোধূলিয়ার একটা ছোটো রাস্তা বিশ্বনাথ গলি। সেখানেই বেশ কয়েকটি ছোটো মন্দির নিয়ে গঠিত আদি বিশ্বনাথ মন্দির। মন্দিরের মূল দেবতা বিশ্বনাথ লিঙ্গটি ৬০ সেন্টিমিটার (২৪ ইঞ্চি উঁচু এবং পরিধি ৯০ সেন্টিমিটার (৩৫ ইঞ্চি)। এটি একটি রুপোর বেদিতে স্থাপিত। মূল মন্দিরটি বর্গাকার। চতুর্ভুজ এই মন্দিরের চারপাশে রয়েছে অন্যান্য দেবতার মন্দির। ছোটো ছোটো ওই মন্দিরগুলি কালভৈরব, কার্তিকেয়, অবিমুক্তেশ্বর, বিষ্ণু, গণেশ, শনি, শিব ও পার্বতীর। রয়েছে জ্ঞানবাপী নামে একটি ছোটো কূপ। কিংবদন্তী, আক্রমণকারীদের হাত থেকে রক্ষা করতে প্রধান পুরোহিত জ্যোতির্লিঙ্গটি নিয়ে ওই কুয়োতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন।

তিন কাঠামোর মন্দির :

মন্দিরের গর্ভগৃহে যাওয়ার জন্য রয়েছে একটি সভাগৃহ। গর্ভগৃহে রুপোর মঞ্চে স্থাপিত জ্যোতির্লিঙ্গটি। তিনটি অংশ বিভক্ত মন্দির কাঠামোর প্রথমটি একটি চূড়াবিশিষ্ট ও দ্বিতীয়টির মাথায় রয়েছে সোনার গম্বুজ এবং তৃতীয়টি পতাকা ও ত্রিশূল-সহ গর্ভগৃহের সোনার চূড়া। বিশ্বাথ মন্দিরের চূড়াটি সাড়ে পনেরো মিটার উঁচু এবং স্বর্ণমণ্ডিত। চূড়াটির জন্য একটন সোনা দেন মহারাজ রঞ্জিত সিংহ ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে। এই স্বর্ণচূড়ার জন্যই বিশ্বনাথ মন্দিরের অন্য নাম স্বর্ণমন্দির। ২০২২ খ্রিস্টাব্দে কাশীবিশ্বনাথ মন্দিরের জন্য ষাট কেজি সোনা দেন দক্ষিণ ভারতের এক ব্যক্তি। ওই সোনা দিয়ে মন্দিরের ভেতরের অংশটিও হয়েছে স্বর্ণমণ্ডিত। আর এই সোনার উচ্চতম চূড়ার জন্যই এটি স্বর্ণমন্দির নামেও বিখ্যাত।

কাশী করিডোর :

কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে প্রতিদিন আসেন প্রায় তিন হাজার দর্শনার্থী বা পুণ্যার্থী। নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে ওই সংখ্যাটা দশ লক্ষও ছাড়িয়ে যায়। সারা দেশ কেন বিশ্বের নানা জায়গা থেকেই মানুষ আসেন এই মন্দিরে কিন্তু সংকীর্ণ গলিঘুঁজির জন্য অসুবিধা হয় সকলের, তাই ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নতুন ভাবে সবকিছু গড়ে তোলার জন্য কাশী করিডোর প্রকল্প নামে আটশো কোটি টাকার প্রকল্পর সূচনা করেন। মণিকর্ণিকা ঘাট থেকে বিশ্বনাথ মন্দির পর্যন্ত ঘাটগুলিকে সুন্দর ও প্রশস্ত করে সংযুক্ত করার এবং প্রকল্পের জন্য ক্ষতিপূরণ দিয়ে তিনশোর বেশি বাড়িঘর এবং প্রায় হাজার দেড়েক দোকানদারকে পুনর্বাসন দিয়ে তৈরি এই করিডোর। করিডোরের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী গত ১৩ ডিসেম্বর ২০২১-এ। এই করিডোর তৈরির ফলে পুণ্যার্থীরা গঙ্গায় স্নান করে সরাসরি মন্দিরে চলে আসতে পারেন। এই প্রকল্প রূপায়িত করার সময় ৪০টি বেশি শতাব্দীপ্রাচীন লুপ্ত মন্দির উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। সব মিলিয়ে এই প্রকল্প রূপায়িত হওয়ায় কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির দর্শন ও পূজার্চনার এক দিক খুলে গিয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বনাথ মন্দির :

দেশ তখন পরাধীন। জাতীয় আন্দোলন ক্রমশই হচ্ছে প্রবল। ওই সময় জাতীয়তাবাদী নেতা বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রধান হোতা মদনমোহন মালব্য এক নতুন ভাবনায় আলোড়িত হলেন। বিগত হাজার বছরে কাশী বিশ্বনাথ মন্দির বারবার ধ্বংস হয়েছে, তাই এই মন্দিরের প্রতিরূপ প্রতিষ্ঠার কথা ভাবলেন তিনি, ১৯৩০-এর দশকে। তাঁর ভাবনার শরিক হলেন বিড়লা পরিবার। তাঁরা নিলেন মন্দির নির্মাণের দায়িত্ব। ১৯৩১-এ হলো শিলান্যাস। নির্মাণ কাজ শেষ হলো ১৯৬৬ সালে। এটিই হলো দেশের সর্বোচ্চ মন্দির। মন্দির চূড়ার উচ্চতা হলো ৭৭ মিটার। মর্মর পাথরে মোড়া এই মন্দির শিবের নামে উৎসর্গীকৃত। কিন্তু এই মন্দিরেই রয়েছে আরও ন'টি মন্দির ও দেব-দেবীর মূর্তি। এক কথায় শিবমন্দির, দোতলায় লক্ষ্মীনারায়ণ এবং দুর্গার মন্দির। অন্যান্য জায়গায় রয়েছে নটরাজ, পার্বতী, গণেশ, পঞ্চমুখী মহাদেব, হনুমান, সরস্বতী ও নন্দী। সম্পূর্ণ গীতা উৎকীর্ণ রয়েছে মর্মর প্রস্তরে। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত এই মন্দিরটি নতুন বিশ্বনাথ মন্দির বা বিড়লা মন্দির নামেও প্রসিদ্ধ। এটি এখন কাশীর অন্যতম দর্শনীয় এবং পূজার্চনার কেন্দ্র।

শিব-পার্বতীর বিয়ে :

লোকবিশ্বাস, শিবের ত্রিশূলের ওপর অবস্থিত কাশীধাম শিবের নিত্যলীলাভূমি। এই লীলাক্ষেত্রের অধিদেবতা বিশ্বেশ্বর বিশ্বনাথের নিত্যপূজার সঙ্গে সঙ্গে শ্রাবণমাসে হয় বিশেষ পূজা অনুষ্ঠান। শিবরাত্রিও ভক্তজনের কাছে আরাধনার পরম পুণ্যলগ্ন। কিন্তু এর বাইরেও বিশ্বনাথের মন্দিরে হয় এমন কিছু বিশেষ অনুষ্ঠান যা সামগ্রিকভাবে এই তীর্থক্ষেত্রকেই দিয়েছে বিশেষ মর্যাদা। বিশ্বনাথ মন্দিরের সেইসব অনুষ্ঠানেরই একটি হলো রঙ্গভরী একাদশী।

ফাল্গুনের শুক্লা একাদশীটি এখানে পালিত হয় রঙিন বা রঙ্গভরী একাদশী হিসেবে। ঐতিহ্য অনুসারে হোলি বা দোলের আগে বাবা বিশ্বনাথ মা ভগবতীর রূপে একটি গাভী নিয়ে মন্দিরে ফিরে আসেন। সে সময় অসংখ্য ডমরুর শব্দে মুখরিত হয় মন্দির। গত দু'শো বছর ধরে হয়ে আসছে ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান।

এই অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলে বহু আগে থেকেই। বসন্তপঞ্চমী বা সরস্বতী পূজার দিন হয় বাবা বিশ্বনাথের তিলক। শিবরাত্রির দিন হয় শিব-পার্বতীর বিয়ে আর রঙ্গভরী একাদশীতে পার্বতী বিদায় নেন শিবের সঙ্গে। গত এক শতাব্দী ধরে মন্দিরে মহন্ত পরিবার ঐতিহ্য মেনে এই অনুষ্ঠানগুলি করে আসছেন। এই অনুষ্ঠানগুলির একটি হলো সপ্তর্ষি আরতি। বৈদিক রীতি অনুসারে বাবার মঙ্গল আরতি হয়। ভোর সাড়ে তিনটের সময়, ভোগ আরতি হয় বেলা বারোটায় আর সপ্তর্ষি আরতি হয় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় এবং শৃঙ্গার আরতি হলো রাত এগারোটায়।

একইভাবে কাশীর যাদব সম্প্রদায় ১৯৩২ থেকে চন্দ্রবংশী গোপ সেবা সমিতি এবং শ্রীকৃষ্ণ যাদব মহাসভার সঙ্গে যুক্তভাবে বাবা বিশ্বনাথের জলাভিষেক করে আসছেন, আর এই ভাবেই কাশীর বিশ্বনাথ সর্ব সম্প্রদায়ের মানুষের সমবেত অর্চনায় হয়ে উঠেছেন দেশের সংহতি ও সংরক্ষণের প্রতীক। ■

ফ ঃ ৪

হিন্দু ধর্মালম্বীদের প্রাণের উৎসব মহা শিবরাত্রি

প্রদীপ মারিক

ভারতবর্ষের পবিত্র বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গে মহা ধুমধামের সঙ্গে মহাশিবরাত্রি পালন করা হয়। দ্বাদশ জ্যোতিলির্ঙ্গকে যদি একসঙ্গে জোড়া যায় দেখা যাবে ভারতবর্ষের মানচিত্রে একটা ত্রিশূলের ওপরেই যেন বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গ অবস্থান করছে। সমগ্র ভূ-ভারতে নটরাজ বিদ্যমান।

সোমনাথ, মল্লিকার্জুন, মহাকালেশ্বর, ওঁকারেশ্বর, কেদারনাথ, ভীমশঙ্কর, বিশ্বেশ্বর, ত্র্যম্বকেশ্বর, বৈদ্যনাথ, নাগেশ্বর, রামেশ্বর ও ঘৃষ্ণেশ্বর বহু মানুষের সমাগম হয়। কাশীতে বসে আছেন বাবা বিশ্বনাথ। ডম্বরু বাজিয়ে শৈব আরাধনার পথে ভক্তেরা। মহা শিবরাত্রিতে বাবার মাথায় জল ঢালতে যে হবে! দেওঘরে বাবা বৈদ্যনাথ ধাম। পুরাণ অনুসারে, লঙ্কারাজ রাবণ এখানে শিবকে খুশি করার জন্য তপস্যা করেছিলেন। তিনি তাঁর দশটি মাথা একটি একটি করে কেটে যজ্ঞের আগুনে আহুতি দিচ্ছিলেন। এতে শিব সন্তুষ্ট হয়ে আহত রাবণকে সুস্থ করে তুলতে আসেন। শিব যেহেতু এখানে বৈদ্য বা চিকিৎসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাই এখানে শিবকে বলা হয় বৈদ্যনাথ। বিশ্বাস অনুসারে, রাবণ হলো শিবের পরম ভক্তের মধ্যে একজন। রাবণের অনুরোধে কৈলাশ পর্বত থেকে রাবণ শিবকে নিয়ে যাচ্ছিল লিঙ্গরূপে। কিন্তু শিবপুত্র গণেশের ছলনাতে রাবণ শিবলিঙ্গ নিয়ে যেতে পারেনি লঙ্কায়। সেই শিবলিঙ্গ বৈদ্যনাথ ধামে প্রোথিত হয়।

মধ্যপ্রদেশের নর্মদা নদীর তীরে অবস্থিত ওঙ্কারেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ। পাঁচতলা মন্দিরের গর্ভগৃহে ছোট্ট শিবলিঙ্গ। সামান্য উচ্চতা, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলে স্পর্শ করে মহা শিবরাত্রিতে পূজা দেয়। মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতে রয়েছে আর এক জ্যোতির্লিঙ্গ, মহাকালেশ্বর। এই মূর্তির বিশেষত্ব এই যে তান্ত্রিক শিবনেত্র প্রথাটি বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে একমাত্র মহাকালেশ্বর মন্দিরে দেখা যায়। ওঙ্কারেশ্বর মহাদেবের মূর্তিটি মহাকাল মন্দিরের গর্ভগৃহের উপরে স্থাপিত। সারা বছরই এখানে ভীড় করেন দর্শনার্থীরা। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম ত্র্যম্বকেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ। মহারাষ্ট্রের নাসিকের কাছে গোদাবরী নদীর উৎসস্থলে অবস্থিত এই জ্যোতির্লিঙ্গ অন্যতম জনপ্রিয়। এই লিঙ্গমূর্তি তিন ভাগে বিভক্ত এবং অন্য শিবলিঙ্গের চেয়ে আলাদা। গুজরাটে সোমনাথ মন্দির। সৌরাষ্ট্রের কাছে প্রভাসে এই মন্দিরে পুজো দিতে সারা বছর ধরে পুণ্যার্থীদের ঢল নামে। জিহাদি শক্তি বারবার হামলা চালিয়েছে এই মন্দিরে। বহুবার মন্দিরটির পুনর্নির্মাণ হয়েছে। এখানকার শিব সোমেশ্বর মহাদেব নামে পরিচিত।

অন্ধ্র প্রদেশে শ্রীশৈলমে অবস্থিত মল্লিকার্জুন জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দিরের কেন্দ্রীয় মণ্ডপে অনেকগুলি স্তম্ভ এবং নন্দীকেশ্বরের একটি বিরাট মূর্তি আছে। সারা বছর ধরে এখানে অনেক অনেক ভক্ত আসেন

মনস্কামনা পূরণ করতে। চারধামের অন্যতম কেদারনাথ উত্তরাখণ্ড রাজ্যের গাড়োয়াল হিমালয়ে অবস্থিত। মন্দাকিনী নদীর তীরে এটি একটি মন্দির শহরও বটে। মহারাষ্ট্রে অবস্থিত অন্যতম উল্লেখযোগ্য ভীমাশঙ্কর জ্যোতির্লিঙ্গ। এই অঞ্চলটি প্রাচীনকালে ডাকিনী দেশ নামে পরিচিত ছিল। এখানে ভীমা নামক এক অসুর বধ করেন বাবা শিব। গুজরাটের জামনগরে অবস্থিত নাগেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গকে বিশেষ মান্যতা দেওয়া হয়েছে। শিব উপাসকরা নাগেশ্বর মন্দিরের জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন পরম পবিত্র বলে গণ্য করে। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম রামেশ্বরম মন্দির। তামিলনাড়ুর রামেশ্বরে অবস্থিত রামেশ্বরম জ্যোতির্লিঙ্গ চারধামের মধ্যে অন্যতম ধাম। একে দক্ষিণ ভারতের কাশীও বলা হয়। সীতাদেবীর বালুকা দ্বারা নির্মিত মূর্তি ও শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ স্থাপিত রয়েছে এই মন্দিরে। জ্যোতির্লিঙ্গের শেষ জ্যোতির্লিঙ্গ রয়েছে মহারাষ্ট্রের ইলোরায়। এখানে অধিষ্ঠিত ঘৃষ্ণেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ। মন্দিরটি লালপাথর দিয়ে তৈরি। তিনি একটা বেলপাতাতেই তুষ্ট, তিনিই ত্রিলোকের অধীশ্বর, তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই।

বেদব্যাসের 'বৃহৎ শিবপুরাণ'-এ রয়েছে, 'শিব হতে শ্রেষ্ঠতর কিছুমাত্র নাই, শিব শম্ভু সবার শ্রেষ্ঠ জানিবে সবাই।' দেবাদিদেব মহাদেব হলেন স্বয়ম্ভু, তাঁকে কেউ সৃষ্টি করেননি। তিনি নিজে নিজেই উদ্ভূত হয়েছেন। তিনি যেমন শান্ত তেমন রুদ্র নটরাজ। মহা শিবরাত্রি হলো হিন্দুধর্মের সর্বোচ্চ আরাধ্য দেবাদিদেব মহাদেবের 'মহা রাত্রি'। শিবপুরাণ অনুসারে, এই রাত্রেই শিব সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের মহাতাণ্ডব নৃত্য করেছিলেন। অন্ধকার আর অজ্ঞতা দূর করার জন্য এই ব্রত পালিত হয়। বেশ কয়েকটি পুরাণে মহা শিবরাত্রির উল্লেখ রয়েছে। বিশেষ করে স্কন্দপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ ও পদ্মপুরাণে। মধ্যযুগীয় শৈব গ্রন্থগুলিতে উপবাস ও লিঙ্গরূপে পূজার কথা উল্লেখ রয়েছে।

কিংবদন্তি অনুসারে, এই মহা শিবরাত্রির রাতে মহাদেব সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের স্বর্গীয় তাণ্ডবনৃত্য করেন। ভক্তেরা তাই এই রাতে মহাদেবের স্তোত্র জপ, শিব ধর্মগ্রন্থ পাঠ এবং সর্বত্র শিবের উপস্থিতি স্মরণ করে। মহা শিবরাত্রি তিন বা দশ দিন ধরে পালিত হয়। প্রতি চান্দ্র মাসে একটি শিবরাত্রি হয়। প্রধান উৎসবকে বলা হয় মহা শিবরাত্রি। শিবপুরাণে ১২টি সংহিতায় এক লক্ষ শ্লোক রয়েছে। প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দশী তিথিতে মহা শিবরাত্রি পালিত হয়। উপবাস রেখে শিবের পুজো করেন সকলে।

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, এদিন শিব ও পার্বতীর বিবাহ হয়েছিল। এই উপলক্ষ্যে মহাশিবরাত্রি পালিত হয়। পার্বতী শিবের বিবাহ শুধু সময়ের অপেক্ষায় ছিল। হর-গৌরীর মিলন হবেই এটাই নিশ্চিত ছিল। পাশাপাশি সমস্ত দেবতাও শিব-পার্বতীর বিবাহে ইচ্ছুক ছিলেন। পার্বতীর কাছ থেকে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে দেবতারা কন্দর্পকে শিবের কাছে পাঠিয়েছিলেন। শিব সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন ও তৃতীয় নেত্র দিয়ে তাঁকে ভস্ম করে দেন। কিন্তু শিবকে নিজের স্বামীরূপে মেনে নিয়েছিলেন পার্বতী। তাই শিবকে পাওয়ার জন্য কঠোর তপস্যা শুরু করেছিলেন। তাঁর তপস্যার জোরে বড়ো বড়ো পর্বতের ভিতও নড়ে গিয়েছিল। তখন শিব ধ্যান থেকে উঠেছিলেন এবং পার্বতীকে বললেন, তিনি যেন কোনও যুবরাজকে বিয়ে করেন। কারণ শিবের সঙ্গে সংস্কার করা সহজ কথা নয়।

কিন্তু হিমালয় কন্যা পার্বতী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি শিব ছাড়া কাউকে বিবাহ করবেন না। পার্বতীর ভালোবাসা দেখে মহাদেব তাঁকে বিবাহ করতে সম্মত হয়েছিলেন। শিব যখন পার্বতীর সঙ্গে বিবাহ করতে যান, তখন তাঁর সঙ্গে ডাকিনি, ভূত-প্রেত, পেত্নিরাও ছিল। ডাকিনি ও পেত্নিরা শিবকে ভস্ম দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিলেন ও হাড়ের মালা পরিয়েছিলেন। শিবের এই আশ্চর্যজনক বরযাত্রী পার্বতীর গৃহে পৌঁছালে সমস্ত দেবতা চমকে ও ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। এই বিচিত্র রূপে শিবকে মেনে নিতে পারেননি পার্বতীর মা। তখন তিনি শিবের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিবাহ দিতে অসম্মত হয়েছিলেন। পরিস্থিতি খারাপ দিকে এগোতে দেখে পার্বতী শিবকে বিবাহের জন্য নিয়মনীতি অনুযায়ী তৈরি হয়ে আসতে প্রার্থনা করেছিলেন। শিব তাঁর প্রার্থনা স্বীকার করেছিলেন। সমস্ত দেবী-দেবতাকে সুন্দর ভাবে বরবেশে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। ঐশ্বরিক জল দিয়ে মহাদেবকে স্নান করানো হয়, রেশমের ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছিল। শিবের এই দিব্য রূপ দেখে পার্বতীর মা বিবাহে রাজি হয়েছিলেন। ব্রহ্মার উপস্থিতিতে এই বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। গোটা দেশে মহা ধুমধামের সঙ্গে পালন করা হয় মহাশিবরাত্রি। শিবরাত্রি আসলে হলো শিব ও পার্বতীর মিলন উৎসব।

ধ্বংসের দেবতা শিবের সঙ্গে এই রাতে মিলন ঘটে প্রেম, সৌন্দর্য ও ক্ষমতার দেবী পার্বতীর। দেবী পার্বতীর অন্য নাম শক্তি। শিব ও শক্তির মিলনের উৎসবই হলো শিবরাত্রি। পুরাণ অনুসারে মহাদেব ও পার্বতীর বিয়ের রাতে অনেক দেব-দেবী, পশু ও রাক্ষস মিলে শিবকে পার্বতীর ঘরে নিয়ে যান। শিব ও পার্বতী হলেন মিলন, প্রেম ও শক্তির আধার। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এদিন সকাল থেকেই শিব মন্দিরগুলিতে ভক্তদের ভিড় উপচে পড়ে। 'ওম নমঃ শিবায়' এবং 'হর হর মহাদেব' মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে ভোর থেকেই মন্দিরগুলির বাইরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন পুণ্যার্থীরা। ভক্তরা সারাদিন উপবাস রেখে রাতে মহাদেবের মাথায় জল ঢালেন। বিশ্বজুড়ে শিব মন্দিরগুলিতে পূজা করা হয়।

শিবপুজোর অন্যতম অঙ্গ শিবলিঙ্গকে স্নান করানোর জন্য মূলত গঙ্গাজল বা দুধ, ঘি, গঙ্গাজল মেশানো বেলপাতা। মহা শিবরাত্রি উপবাস ভক্তদের মনে করিয়ে দেয় যে অহংকার ও মিথ্যা শুধুমাত্র পতনের দিকে নিয়ে যায়। পুরাণ অনুসারে, চতুর্দশী তিথিতে শিবলিঙ্গ রূপে মহাদেব আবির্ভূত হন। সর্বপ্রথম ভগবান বিষ্ণু ও ব্রহ্মা তাঁকে পূজা করেছিলেন। সেই থেকে এই শুভ দিনটিকে ভগবান শিবের জন্মদিন হিসেবেও পালন করা হয়। বিশ্বাস করা হয় যে এইদিন উপবাস রাখলে ভক্তের জীবন সুখ শান্তিতে ভরে যায়। পাশাপাশি রোগ থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়। ■

সংস্কার ভারতীর উদ্যোগে নাট্যশাস্ত্রপ্রণেতা ভরতমুনি জয়ন্তী উদ্‌যাপন

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি মাঘীপূর্ণিমার সন্ধ্যায় সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গের উদ্যোগে মানিকতলাস্থিত কলা স্যন্দন সভাগৃহে সাড়ম্বরে পালিত হলো নাট্যশাস্ত্রপ্রণেতা ভরতমুনি জন্মজয়ন্তী এবং বিকাশ ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতার অনুষ্ঠান। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন উত্তর কলকাতা জেলা সমিতির সভাপতি সুজিত দাস এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ভাব সংগীত 'সাধয়তি সংস্কার ভারতী' পরিবেশনের পর বিশিষ্ট অতিথিদের কপালে চন্দনের টিপ দিয়ে এবং উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে নাটকের গান পরিবেশন করেন সুপ্রীতি ঘোষ, রুদ্রাণী চৌধুরী, অঞ্জনা মল্লিক এবং সীমা দে।

বিকাশ ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতার প্রাককথনের ভাষণ রাখেন সুভাষ ভট্টাচার্য। স্মারক বক্তৃতার বিষয় ছিল 'নাট্যশাস্ত্রপ্রণেতা ভরতমুনি এবং রবীন্দ্র নাটকের গান'। বক্তা ড. পার্থজিৎ সেনগুপ্ত। অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় এবং বিস্তারিতভাবে ড. সেনগুপ্ত নাট্যশাস্ত্রের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। কথার মাঝে রবীন্দ্রগানের প্রাসঙ্গিক ব্যবহার তাঁর ভাষণকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। তিনি একাধারে সুবক্তা ও দক্ষ সংগীতশিল্পী হিসেবে উপস্থিত সকলের মন জয় করে নিয়েছিলেন।

সেদিনের শেষ অনুষ্ঠান ছিল ছোটো নাটক 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'। সংস্কার ভারতীর আমন্ত্রণে নাটকটি পরিবেশন করে 'দি বয়েজ ওন শিশু কিশোর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র'-এর ন'জন কিশোর-কিশোরী— সোমনাথ, মায়াঙ্ক, আদিল, প্রতিষ্ঠা, অভিনব, শুভশ্রী, হিরন্ময়, অগ্নিভ ও ঋষভ। নাট্য রচনা, পরিচালনা ও সংগীতে ছিলেন সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গের সহ সম্পাদক অমিত দে। অভিনয়ে-গানে-বাদ্যে-নৃত্যে নাটকটি যথেষ্ট উপভোগ্য হয়ে ওঠে এবং উপস্থিত সকলের প্রশংসা লাভ করে।

পরিপূর্ণ সভাকক্ষে অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যা শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায়, কেন্দ্রীয় কোষটোলির সদস্য ভরত কুণ্ডু, প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক উদয় দাস, দক্ষিণবঙ্গ কার্যকরী সমিতির বিশিষ্ট অধিকারীগণ এবং বেশ কয়েকজন নাট্যব্যক্তিত্ব। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক সারদা প্রসাদ পাল এবং স্বস্তিকা পত্রিকার পূর্বতন সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য।

সমবেত শান্তিমন্ত্র পাঠ করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

আকাদেমি অব ফাইন আর্টসে 'পঞ্চাশে বিবেকানন্দ চিত্রে প্রকাশ' প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন

সম্প্রতি আকাদেমি অব ফাইন আর্টসে এসরাজের সুরেলা বাদনের আবহে শিল্পী বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় অঙ্কিত 'পঞ্চাশে বিবেকানন্দ, চিত্রে প্রকাশ' প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়ে গেল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন শিল্পীর পিতা নিমাই কুমার মুখোপাধ্যায়, শিক্ষক পার্থপ্রতিম দেব, শিক্ষক বিরাজ কুমার পাল এবং রামকৃষ্ণ মিশন গোলপার্কের স্বামী বেদস্বরূপানন্দজী মহারাজ।

মালদহে শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ জ্ঞানযজ্ঞ সপ্তাহ উদ্‌যাপন

মালদহ জেলার শিবাজীনগরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ জ্ঞানযজ্ঞ সপ্তাহ সম্পন্ন হলো। প্রতিদিন সন্ধ্যায় শ্রীহরি সৎসঙ্গ সমিতির ব্যাস কথাকারের মুখে ভাগবত পাঠ শোনার জন্য প্রচুর ভক্তজনের সমাগম হয়েছিল।

জ্ঞানগঞ্জের মহাযোগী শ্রীশ্রী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

ড. দেবনাথ মল্লিক

ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ অধ্যাত্ম সাধনার ধারায় যে সকল মহাপুরুষ নিজেদের সাধনার বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল আলোকবর্তিকার মতো দীপ্যমান, মহাযোগী শ্রীশ্রী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস তাঁদের অন্যতম। তিনি মানব মনের নতুন পথের সন্ধান তো দিয়েছেনই বরং জগতের ধর্মপিপাসু মানবজাতিকে ভারতের আধ্যাত্মিক ভাব-গঙ্গায় অবগাহন করারও সুযোগ করে দিয়েছেন।

সময়টা ছিল ১৮৫৭ সালের ১১ মার্চ, ১২৬৩ বঙ্গাব্দের ২৯ ফাল্গুন। বর্ধমান শহর হতে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে 'বণ্ডুল' বলে একটি ছোট্ট গ্রাম। গ্রামটির প্রাকৃতিক শোভা ছিল অপূর্ব। গ্রামটির চারদিকে বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত্র এবং গ্রামের মধ্যস্থলে শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মন্দির। এই মন্দিরের খুব কাছেই অখিল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বসবাস করতেন। তিনি অতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, পরিবারটিও নিতান্তই মধ্যবিত্ত। সংসারের আয়ের উৎস ছিল যজনযাজন। গ্রামের বাইরে উত্তরদিকে একটি বটগাছ এবং তার নিকটবর্তী শ্মশান। এই সিদ্ধেশ্বরীমাতার মন্দির এবং শ্মশান-সংলগ্ন বটতলা এক কথায় ছিল মনোরম আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ। অখিলচন্দ্রের দুই পুত্র ভূতনাথ ও ভোলানাথ। এই ভোলানাথই পরবর্তী জীবনে 'শ্রীশ্রী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস' নামে সকলের কাছে সুপরিচিত। ভোলানাথের জন্মের ছ'মাস পরেই পিতা অখিলচন্দ্র দেহত্যাগ করেন।

মাতা রাজরাজেশ্বরী দেবীর পরিবারটি ছিল নিতান্তই মধ্যবিত্ত পরিবার। ভোলানাথের শৈশবে তাঁর কাকা (বাবার সহোদর নয়) চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁদের আদরযত্নে লালন-পালন করেছেন এবং তিনি নিজেও কলকাতায় চাকুরী করে উপার্জন করতেন, বড়ভাই ভূতনাথও বর্ধমানে কম্পাউণ্ডারী এবং ডাক্তারি করে একান্নবর্তী সংসার পরিচালনায় সাহায্য করতেন। যদিও তিনি অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই মারা যান।

যখন ভোলানাথের বয়স বারো বছর, সেই সময় একটি খ্যাপা কুকুর তাঁকে কামড়ায় এবং এর ফলে তিনি অসহ্য জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করেন। জ্বালায় অস্থির হয়ে জনৈক আত্মীয়ের সঙ্গে চন্দননগর সংলগ্ন গোঁদলপাড়ায় এর চিকিৎসার্থে আসেন। কিন্তু চিকিৎসাতেও কোনো ফল না হওয়ায় স্থির করেন ওই অসহ্য জ্বালা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আত্মহত্যার পথই বেছে নেবেন। নিকটেই ভাগীরথী, এক সন্ধ্যায় ডুবে আত্মহনন করতে গিয়েও করা হলো না। জলে নামতে গিয়ে দেখলেন মাঝ গঙ্গায় এক জটাজুটসমন্বিত সাধু বার বার ডুব দিচ্ছেন, আর মাথা ওঠানোর সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার জলরাশি স্তম্ভাকারে তাঁকে বেষ্টন করে উপরে উঠছে। সেই সন্ন্যাসীর দৃষ্টিও বালকটির উপর পড়ল। সাধু হাত তুলে ভোলানাথকে জলে নামতে বারণ করলেন এবং কিছুক্ষণ পর তীরে এসে ভোলানাথের কাছে সকল বৃত্তান্ত শুনে বললেন— 'ও কিছু নয়, আমি এখনই তোমার সকল জ্বালার অবসান করে দিচ্ছি'— এই বলে বালকটির ক্ষতস্থানে নিজের হাত বুলিয়ে দিলেন। নিমেষের মধ্যে তাঁর সমস্ত ব্যথা দূর হয়ে গেল।

পরদিন আবার সেই যোগীর সন্ধানে বালক ভোলানাথ সেই গঙ্গার তীরে এলেন এবং তাঁর দেখাও পেলেন। সেই যোগী গঙ্গার তীরে বসে সন্ধ্যা, পূজা-পাঠ করছেন এবং জলস্পর্শ করামাত্র গঙ্গার জলরাশি স্ফীত

হয়ে ওঠে। সেই পূজাদি শেষ হলে বালকটি ছুটে যায় সেই সন্ন্যাসীর কাছে। তাঁকে প্রণাম করে বলেন, 'আপনি আমাকে জীবন দিয়েছেন, আপনি আমার জীবনের সব ভার গ্রহণ করুন।' সন্ন্যাসী বললেন— 'বাবা, অধীর হয়ো না, সময়ে সব হবে, সদ্‌গুরুও পাবে'— এই বলে একটি যোগাসন দেখিয়ে একটি বীজ বলে দিলেন এবং বললেন— 'এই বীজটি সকাল, সন্ধ্যায় জপ করবে।' সেই যোগী মহাপুরুষ এই বলে চলে গেলেন। বালক ভোলানাথের জীবনে শুরু হলো এক নতুন অধ্যায়।

প্রায় বছর দুই বাদের ঘটনা। ভোলানাথ এই সময় সংস্কৃত শিক্ষার্থে বর্ধমান শহরে (তাঁর বাসস্থান-বণ্ডুল গ্রামের নিকটবর্তী বর্ধিষ্ণু জনপদ) এসেছিলেন। বর্ধমানের রাজপথ দিয়ে যেতে যেতে তিনি দেখেন একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান কিছু বলছেন এবং কিছু লোক অতি আগ্রহ সহকারে তাঁর কথা শুনছেন। ভোলানাথও আগ্রহাতিশয্যে সেখানে এগিয়ে গিয়ে শুনলেন, একজন অদ্ভুত সাধু এসেছেন। তিনি নদীর তীরে বসে জলস্পর্শ করতে গেলে নদীর জল কিছুটা স্ফীত হয়ে এগিয়ে এসে তাঁর হাত স্পর্শ করছে এবং তাঁর শরীর ঘিরে স্তম্ভাকারে বেষ্টন করছে। ভোলানাথের বুঝতে আর বাকি থাকল না যে ইনিই সেই সন্ন্যাসী! ভোলানাথ সেই মুসলমান ভদ্রলোকের কাছে আলাপ চারিতায় জানতে পারলেন কয়েকদিন পরেই তিনি ঢাকায় ফিরে যাবেন। তখন তিনি ওই ভদ্রলোকটির কাছে সন্ন্যাসীর কাছে যাবার তীব্র আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু বাড়ির তো অনুমতি চাই। ফিরে গেলেন বণ্ডুলে। বাড়ির সকলেই একবাক্যে না বলে দিলেন, একমাত্র মা ছাড়া। মা ছেলেকে চিনতেন। বললেন, 'কোষ্ঠিতে ভুরির (মা তাঁকে এই নামেই ডাকতেন) পরমায়ু মাত্র বাইশ বৎসর। যদি ওইরকম মহাপুরুষের সংস্পর্শে ওর পরমায়ু বাড়ে তাহলে তো ভালোই'। শেষ পর্যন্ত অনুমতি নিয়ে বর্ধমানে ফিরে এসে হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে আর এক প্রায় সমবয়সী বন্ধুকে নিয়ে সেই ভদ্রলোকটির সঙ্গে ঢাকায় গেলেন এবং ওই সাধুর সমীপে উপস্থিত হলেন। তিনি ওই বালকদ্বয়কে জঙ্গলের মধ্যে একটা ঝিলের ধারে সাক্ষাৎপূর্বক খুবই আনন্দিত হলেন এবং ওই দুইজনকে গৃহে ফিরে যেতে উপদেশ দিলেন (হয়তো পরীক্ষার্থে)। কিন্তু তাঁরাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

অবশেষে গভীর রাত্রে দুই হাতে বালকদুটির হাত ধরে বনের পথে যাত্রা শুরু করলেন এবং কিছুক্ষণ পর তাঁদের চোখ কাপড় দিয়ে বেঁধে দিয়ে বললেন, 'কোনো ভয়ের কারণ নেই'। বালক দুইজনের মনে হলো তাঁরা সারারাতই হেঁটেছেন। পথে তাঁরা বাঘের ডাক, শৃগালের চিৎকারও শুনতে পেয়েছিলেন। সকলে চোখের কাপড় খুললে তাঁরা দেখলেন কোনো এক পাহাড় অঞ্চলে তাঁরা উপস্থিত হয়েছেন। খবর নিয়ে জানলেন স্থানটির নাম বিন্ধ্যাচল। হিমালয় থেকে কিছু দূরে একটি আশ্রমে এবং সেখান থেকে ওই একইভাবে হিমালয় অতিক্রম করে পশ্চিম তিব্বতে 'জ্ঞানগঞ্জ' নামক একটি আশ্রমে উপস্থিত হলেন। জায়গাটি অতি মনোরম, সদা বসন্ত সেখানে বিরাজমান এবং আশ্রমটি বহু ব্রহ্মচারী, দণ্ডি, পরমহংস যোগীগণ অধ্যুষিত। তাঁরা ওই স্থানে দিনকয়েক অতিবাহিত করেন। সেই সময় তাঁদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়। তাঁরা প্রত্যক্ষ করলেন অনেক যোগী সারা দিনরাত নানা যন্ত্র নিয়ে বিজ্ঞান আলোচনায় ও গবেষণায় রত। সেখানে তাঁরা সহস্রাধিক 'কুমারীভোজন'ও প্রত্যক্ষ করলেন।

সেখানে বিভিন্ন যোগীদের বয়স কারো চারশো, কারো পাঁচশো বছর। ওই বালকদ্বয় যে সন্ন্যাসীর সঙ্গে এসেছিলেন, তাঁর নাম শ্রীনীমানন্দ পরমহংস। তিনি জন্মসূত্রে বাঙ্গালি ছিলেন এবং তাঁর বয়সও ছিল পাঁচশো বছরের বেশি। এই আশ্রম থেকে ভোলানাথ ওই সাধুর সঙ্গে উত্তর তিব্বতে অতি দুর্গম, কিন্তু অতিরমণীয় আরেকটি আশ্রমে যান, যার নাম 'মনোহর তীর্থ'। এখানে তাঁরা 'ব্রহ্মর্ষি মহাতপা'-র সাক্ষাৎ লাভ করেন। মহাতপা হলেন নীমানন্দ-সহ অনেক পরমহংসাদির গুরু, বয়স প্রায় তেরশো বছর। তাঁরও গুরুমাতা যাঁকে সকলে 'ক্ষেপাই মা' নামে ডাকতেন, তাঁর বয়স মহাত্মার বয়সেরও দ্বিগুণ। কিন্তু দেখতে তাঁকে বৃদ্ধ দেখায় না, তরুণীই মনে হয়। ব্রহ্মর্ষি মহাতপা ভোলানাথের মাথায় ডানহাত রাখলেন এবং কানে একটি মন্ত্র বলে দিলেন। দীক্ষান্তে তাঁর আরো দুই শিষ্য পরমহংস শ্রীশ্রী ভৃগুরামস্বামী এবং শ্রী শ্যামানন্দ পরমহংস ভোলানাথের যথাক্রমে যোগশিক্ষার ও বিজ্ঞান শিক্ষার দায়িত্ব নেন। জ্ঞানগঞ্জের নিয়মানুযায়ী ভোলানাথ বারো বছর ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করেন। তারপর চারবছর দণ্ডী এবং চার বছর সন্ন্যাসীর আচার অতিবাহিত করার পর তিনি 'তীর্থস্বামী' পদে উন্নীত হন। প্রসঙ্গত, ব্রহ্মচর্য অবস্থাতেই তিনি 'বিশুদ্ধানন্দ' নাম গ্রহণ করেন।

সুদীর্ঘকাল যোগমার্গে বিচরণের পর তাঁর গুরুর আদেশ এল তাঁকে ঘরে ফিরে গিয়ে গৃহস্থের জীবনযাপন করতে হবে। এতে ভোলানাথের মনে ভয় এবং সংশয়ের উদ্রেক হলো। তিনি মুখে কিছু না বললেও গুরু তো অন্তর্যামী। তিনি শিষ্যের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন, এতে তাঁর (শিষ্যের) আধ্যাত্মিক কোনো ক্ষতিই হবে না, সাধন স্বাভাবিকভাবেই চলবে এবং উচ্চতর শক্তির তিনি আধার হবেন। কিন্তু এত বয়সে (প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর) বিবাহ করে সংসার প্রতিপালনের উপায় কী হবে? এই ব্যাপারেও গুরুদেব 'চিকিৎসা এবং যোগ-জ্যোতিষ'-এর দ্বারা অর্থ উপার্জনের উপায় বলে দিলেন। তিনি স্বীয় যোগসিদ্ধিবলে চিকিৎসাবিদ্যা খুব অল্পদিনেই আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অতঃপর বর্ধমান জেলার

গুসকরা গ্রামে জমিদার— 'চোঙ্গদার'দের আশ্রয়ে প্রায় আঠাশ বছর (১৮৯৩ হতে ১৯২১) চিকিৎসা ব্যবসার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। উল্লেখ্য, তাঁর যোগশিক্ষাগুরু শ্রীশ্রীভৃগুরাম পরমহংসই তাঁর জন্য এই স্থান নির্বাচন করেছিলেন। তাঁর চিকিৎসাকালেও সর্বসাধারণের সামনে তাঁর যোগ শক্তি প্রকাশ পেত। সেই সময় থেকেই অনেকে তাঁকে 'ভোলানাথ সাধু' বলত।

এই সময়ও তাঁর নিজস্ব সাধনার ধারা কিন্তু অব্যাহত ছিল। চিকিৎসকের চেয়ে তাঁর যোগজীবনের খ্যাতিই সমাজে সাধারণ মানুষের মধ্যে আলোড়ন তোলে। দৈনন্দিন জীবনের সব কাজকর্মের শেষে গভীর রাত্রে নিজের আসনে বসে সাধন ও যোগ ক্রিয়ার মধ্যে ব্যাপৃত থাকতেন। আবার অমানিশায় গুসকরার শ্মশানে গিয়ে শক্তি সাধনার নানা ক্রিয়া অনুশীলন করতেন। তাঁর ঘরে দুটি বিষধর সাপ থাকত— শিবদাস আর শিবদাসী (বিশুদ্ধানন্দজীই নামগুলি দিয়েছিলেন)। যোগ ক্রিয়াকালীন তারা পরমহংসদেবকে জড়িয়ে থাকত।

পরবর্তীকালে বিশুদ্ধানন্দজী গুসকরা হতে বর্ধমানে আসেন। এই সময়কালীন তিনি বিভিন্ন তীর্থাদি (কামরূপ কামাখ্যা, রামেশ্বর) ভ্রমণ করেন। তিনি কাশীধামেও হনুমানঘাট এবং মালদহিয়ায় বসবাস করতেন। প্রসঙ্গত মালদহিয়ায় (বেনারস রেলস্টেশন হতে অনতিদূরে) তাঁর প্রতিষ্ঠিত আশ্রম 'শ্রীশ্রী বিশুদ্ধানন্দ কানন' এখনো বর্তমান। সেখানে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'নবমুণ্ডি আসন', ১০৮ শিব, 'সূর্য বিজ্ঞান মন্দির' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'সূর্যবিজ্ঞান মন্দির'টি দ্বিতল বিশিষ্ট, এখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ।

বিশুদ্ধানন্দজী আপন খেয়ালখুশি মতো বিভিন্ন বিভূতি প্রদর্শন করতেন, মূলত ভক্তকুলের মনে অবিশ্বাসের ভাব দূর করতে। বহু ভক্তসমক্ষে তুলা এবং লেন্স সহযোগে সৌরশক্তির সাহায্যে বহুমূল্য পোখরাজ, হীরক, প্রবাল, স্ফটিক প্রভৃতি তৈরি করতেন। কখনো আবার এগুলিকে তুচ্ছ বস্তুর মতো নদীতে ফেলে দিতেন। অবশ্য বহু ভক্ত, শিষ্যদের বিশেষ অনুরোধে তাদের এগুলি দিতেন। তবে এইসব ক্রিয়া, বিভূতি প্রদর্শনের জন্য তিনি কুমারী ভোজন করাতেন। এই কুমারী ভোজন সম্পর্কে এক ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'এগুলি দেখানো যে অপরাধ। যারা বিশুদ্ধ বস্তু দেখবার অধিকারী নয়, তাদের এসব দেখানো অপরাধ নয় তো কি? হাতির বোঝা ছাগলের ঘাড়ে চাপানো অপরাধ বই কী?' আবার বলতেন, 'যখন আমি কিছু দেখাই, তখন সেই প্রক্রিয়ার ফলে আমার শরীরে তাপ জন্মে, সেই তাপ প্রশমনের উপায় হচ্ছে কুমারী ভোজন।' তাঁর কাছে কুমারী জগদম্বার প্রতীক। কুমারী পূজার পর তিনি তাদের প্রসাদ গ্রহণ করতেন। আশ্রিতদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্পর্কে তাঁর সজাগ দৃষ্টি থাকত। বলতেন— 'ক্রিয়া করো, ক্রিয়া করো, তা থেকেই নির্ভরতা আসবে, সকল বুঝতে পারবে, আর বিচলিত হবে না। ক্রিয়া করলেই ঈশ্বরের কৃপা উপলব্ধি করা যায়। আরে বাবা, কৃপা তো অনবরতই মাথার উপর ঝরছে, কিন্তু তা বুঝতে পারছ কি? স্ত্রীর পিছনে, অর্থের পিছনে, ভালো আহারের পেছনে যেমন ছুটছ— তখন তোমরা কর্তা। আর শুধু সাধন-ভজনের বেলায়— বাবা, কৃপা করুন।'

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চিকিৎসক) গুসকরায় বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসকে দর্শন করতে যান। বিশুদ্ধাননন্দজী ডাক্তারবাবুকে কথাপ্রসঙ্গে বলেন যে মানবদেহের প্রচলিত কয়েকটি দ্বার ছাড়াও আরও অনেক দ্বার বর্তমান। প্রতিটি লোমকূপই এক একটি দ্বার, লৌকিক বা স্থূল চোখে এগুলি ধরা পড়ে না বটে, কিন্তু যোগীরা অবলীলায় তা দেখিয়ে দিতে পারেন। তখন ডাঃ সরকার পরমহংসদেবকে ওইগুলি দেখানোর জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় তিনি তা দেখান। ডাঃ সরকার অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করেন যে বিশুদ্ধানন্দজী তাঁর দেহের লোমকূপ দিয়ে বড়ো বড়ো স্ফটিকের দানা প্রবেশ করাচ্ছেন, আবার হাত দিয়ে ঘষবার সঙ্গে তা বের হয়ে যাচ্ছে। এইসব দেখে তিনি বলেছিলেন, 'স্বামীজী, আমাদের বৈজ্ঞানিকদের দেহতত্ত্ব কত যে অসম্পূর্ণ, আজ তা আপনি ভালোভাবেই আমায় দেখিয়ে দিলেন।' তাঁর দেহ হতে প্রায়শই পুষ্পগন্ধ (পদ্মগন্ধ) নির্গত হতো। অনেকের মুখে শোনা যায় তিনি যখন বণ্ডুলে অবস্থান করতেন, তখন স্থানীয় মানুষজনও তাঁর উপস্থিতি টের পেত ওই পদ্মগন্ধের সৌরভে। সারা ভারতবর্ষের লোক তাঁকে 'গন্ধবাবা' নামেই চিনত। তিনি বলতেন বিভিন্ন দেব-দেবীর গাত্রগন্ধও বিভিন্ন প্রকার। যোগীরা এর সন্ধান পান। বিভিন্ন সময়ে অনুসন্ধিৎসু ভক্তদের তিনি এর আস্বাদনও করিয়েছেন।

বহু যোগী, ঋষিরা তাঁর সান্নিধ্যে আসতেন। এই প্রসঙ্গে ত্রৈলঙ্গস্বামী, রামদাস কাঠিয়াবাবা, গম্ভীরনাথ, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্যামাচরণ লাহিড়ী, আনন্দময়ী মা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। বারাণসীর আশ্রমে আনন্দময়ী মা এসেছেন পরমহংসদেবের দর্শনে। তাঁর সামনেই যোগীবর অন্যান্য ভক্তদের বিশেষ আগ্রহে তাঁর 'বিভূতিলীলা' দেখাচ্ছেন। একটি কুল থেকে স্ফটিক তৈরি করছিলেন তিনি। আনন্দময়ী বললে— 'বাবা, তুমি এসব দেখাচ্ছ, কিন্তু এর চাইতে তোমার ভেতরে যে দুর্লভ বস্তু আছে, তা এদের দাও না কেন?' উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন— 'নেয় কে?' অর্থাৎ উপযুক্ত পাত্রের কথা তিনি বলতে চাইছিলেন। সেই সময় ওখানে উপস্থিত ছিলেন বিশুদ্ধানন্দজীর প্রিয় শিষ্য মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ (বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য)।

(শ্রীশ্রী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

শিবের পছন্দের কুল 'হরবরই'

মিলন খামারিয়া

'হরবরই', 'অরবরই' বা 'রয়্যাল' ফলটিকে আপনারা হয়তো চেনেন। ইংরেজিতে Star Gooseberry, Malay Gooseberry বা Country Gooseberry নামে ডাকা হয়। স্থানীয় নাম কোথাও নইল, নোয়েল, নলতা, রোয়াইল, ফরফরি। শিবরাত্রির আশেপাশের সময় গাছের ঝরা পাতার মাঝেই কচি বিটপ বা 'ফেকরি' বের হতে দেখা যায়। আর গাছের কাণ্ড জুড়ে হয়ে থাকা বড়ো পাকাফল শিবরাত্রির পুজোর সময় সংগ্রহ করে দেবতাকে নিবেদন করেন লোকসমাজের একাংশ।

হালকা হলুদ রঙের ছোটো খাঁজকাটা এই ফল। গাছটি গুল্ম-সদৃশ, বৃক্ষ ও গুল্মের মাঝামাঝি। দুরন্তপনা করে ফল পাড়তে গেলেই দু' একটা ডাল ভেঙে আসে। আমলকি গোত্রের (Family Phyllanthaceae) এই ফলে যথেষ্ট ভিটামিন-সি থাকে। এর বিজ্ঞানসম্মত নাম *Phyllanthus acidus*.

শিবপূজার নৈবেদ্য সাজাতে ছোটোরা হরবরই ফল সংগ্রহ করে আনতো কয়েক দশক আগেও। গ্রামবাঙ্গলার ছেলেবেলায় এ এক দারুণ মজার ফল। 'হরবরই' কথাটি সম্ভবত 'হর' অর্থাৎ 'শিব' এবং 'বরই' অর্থাৎ কুলসদৃশ টক ফল— কথা দু'টি থেকে এসেছে। সুতরাং দাঁড়ালো 'শিব-কুল'। 'বরই' বা 'কুল' দেবী সরস্বতীর আশীর্বাদ ধন্য এক ফল। তাই সরস্বতী পূজায় নিবেদনের আগে খাওয়া হয় না। আমরা এটা খুব মেনে চলতাম, কারণ পড়াশোনা ছাড়া বড়ো হওয়ার সুযোগ তেমন ছিল না তখন। তাই দেবীকে তুষ্ট রাখার জন্য আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা ছিল। ছোটোবেলায় একে 'ভারতীয়-কুল' 'সর-বরই' বলেও ডাকতাম। দেবী সরস্বতীর অপর নাম 'ভারতী', তাই 'ভারতী-কুল' বা 'ভার্তিকুল'। আরও কিছু কুল সদৃশ ফল থেকে আলাদা করে বোঝাতে এমন নাম ব্যবহার হতো। যেমন ছিল বন্য 'সিয়াকুল' বা 'সেকুল'। এটা আদতে 'সীতাকুল'; বন্য কাঁটা ঝোপের মতো খর্বাকার গাছ, তাতে পাতার কোলে কোলে অজস্র ছোটো পাকা ফল।

শিবরাত্রিতে আমরা ছোটোরা বন-বাদাড় থেকে কুল, শিব-কুল আর সিয়া-কুল সংগ্রহ করে খানিক নৈবেদ্যের জন্য বাড়িতে দিতাম আর বালক-বালিকারা সমবেতভাবে নুন দিয়ে দুপুরের পর টকফল বেশ আমোদ করে খেতাম। এত টক-টেঁশো ফল দামাল বাচ্চা ছাড়া কে-ই বা চেয়ে খাবে! আর ভগবান শিবেরও পছন্দ এইসব বুনো ফল-পাকুড়। তাই তো তিনি একাধারে মহেশ্বর শিব হয়ে শাস্ত্রীয় স্তরেও মান্যতা পান, আবার লৌকিক দেবতা হিসেবেও অন্তেবাসী-প্রান্তবাসী মানুষের প্রিয় ঈশ্বর। □

কাশীর সারস্বত চর্চা

ড. অরূপম সান্যাল

সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভারতে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা হয়ে আসছে নিরবচ্ছিন্নভাবে। শুধু ভারতেই নয়, ভারতের বাইরে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতেও এই ভাষা ও সাহিত্যের চর্চার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতে তথা বহির্ভারতে তাই বিভিন্ন সারস্বত চর্চা কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। বিবিধ আঞ্চলিক প্রাকৃত ভাষার দ্বারা বিচ্ছিন্ন ভারতের সারস্বত চর্চার ঐক্যসূত্র ছিল এই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য। যদিও এই সারস্বত চর্চায় বিভিন্ন অঞ্চলের অবদান ছিল তবে কাশী তাঁর অবদানের ক্ষেত্রে স্বমহিমায় প্রোজ্জ্বল হয়ে আছে। অনাদিকাল থেকেই কাশী বিদ্যাক্ষেত্র হিসেবে প্রসিদ্ধ। সেই সুপ্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যের যুগ থেকেই আমরা তার প্রমাণ পাই। তবে প্রাক্ মধ্যযুগ বা মধ্যযুগ থেকে প্রচুর পরিমাণে ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় কাশীর সারস্বত চর্চা ও বিদ্যাকেন্দ্রগুলির। সমগ্র ভারতের কাছে কাশী শুধু একটি অধ্যাত্মক্ষেত্রই নয়, ছিল সারস্বত চর্চার মহাপীঠ। তবে এই অধ্যাত্মক্ষেত্র হবার কারণেও কাশীতে সারস্বত চর্চা গতি ও প্রকৃতিতে বৈচিত্র্য এসেছে।

বহু পণ্ডিত শেষ জীবনে মুক্তি লাভের আশায় এই নগরে এসে বসবাস করেন এবং সেখানে থেকে বিভিন্ন ছাত্রদের শাস্ত্রের পাঠ দিতে থাকেন। মুসলমান/যবন আক্রমণের পরবর্তীকাল থেকেই কাশীতে বিভিন্ন কারণে পণ্ডিতদের আগমন হয়। তাতে মুখ্য কারণ যেমন সারা উত্তর ভারত জুড়ে পৃষ্ঠপোষক রাজাদের ক্রমশ অভাব, অন্যদিকে আর একটি কারণ কাশীরাজের বিদ্বানদের প্রতি পৃষ্ঠপোষণও বটে। কাশীর সারস্বত চর্চায় প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর সারস্বত সমাজের সর্বভারতীয় চরিত্র। মহারাষ্ট্র, দাক্ষিণাত্য, বাংলা, বিহার, গুজরাট ইত্যাদি অনেক স্থান থেকে পণ্ডিতেরা এখানে এসে বসবাস করেন। কেউ কেউ আবার প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নিজের জন্মভূমির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেও কাশীতে থেকে যান। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর থেকে এই বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পণ্ডিতদের কাশীতে বসবাসের বহু সাক্ষ্য পাওয়া যায়। তাই কাশীর পণ্ডিত গোষ্ঠীর এই সর্বভারতীয় চরিত্র আমরা দেখতে পাই। বহু বিদ্বজ্জন ও মনীষীগণ বংশানুক্রমে কাশীতে বাস করতে থাকেন। সাহিত্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, বেদান্ত, মীমাংসা ইত্যাদি বিভিন্নশাস্ত্রের চর্চা কাশীকে সুসমৃদ্ধ করেছে।

কাশী ভারতের একটি প্রদেশের একটি নগর বিশেষ হলেও একা অন্যান্য প্রদেশের অসংখ্য নগরের তুলনায় অধিক অবদান রেখেছে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য এবং তার চর্চায়। বহুমুখী ও বৈচিত্র্যপূর্ণ এই অবদানের জন্য কাশী তাই স্বীয় গৌরবে ও মাহাত্ম্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অনেক বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র ও পীঠস্থান ছিল। সেই পীঠস্থান ও সারস্বতচর্চাকেন্দ্রগুলি নিজের নিজের প্রদেশে বা অঞ্চলে যথেষ্ট প্রভাবশালীও ছিল। সেই

অঞ্চলগুলিতে শাস্ত্রীয় কোনো বিষয়ে যদি বিতর্ক উপস্থিত হতো, কোনো মীমাংসার প্রয়োজন হলে সেই অঞ্চলের পণ্ডিতমণ্ডলী নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করতেন। সমস্ত শাস্ত্রীয় সমস্যার সমাধান করতেন। তখন সমাজ শাস্ত্রনির্ভর হওয়ায় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরাই বিতর্কিত সামাজিক বিষয়ের মীমাংসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতেন। তাই সেই সব অঞ্চলে সেই আঞ্চলিক পণ্ডিতমণ্ডলীর মান ও গুরুত্ব ছিল। কিন্তু কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলী পাণ্ডিত্যে এতটাই উচ্চতায় পৌঁছেছিলেন যে অন্যান্য বিভিন্ন প্রদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীও কাশীর পণ্ডিত বর্গের সিদ্ধান্ত বিবিধ বিতর্কিত বিষয়ে চূড়ান্ত বলে গণ্য করতেন। কাশীর এই সর্বমান্যতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেয়েছে।

ঊনবিংশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর দলিল দস্তাবেজ আমাদের সেইরকমই সাক্ষ্য দেয়। ন্যায়, বেদান্ত, ব্যাকরণ, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি বহুবিধ ক্ষেত্রে অপ্রতিহত গতি ছিল এই কাশীর পণ্ডিতদের। ইউরোপীয়দের আগমনের পরবর্তীকালেও সেই কারণে গোটা ভারতের বিদ্যার্থীদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়েছিল কাশী। তাঁরা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চার জন্য কাশীকেই প্রধানকেন্দ্র রূপে গণ্য করতে শুরু করেন। সমস্ত বিদ্বজ্জনদের কাছেই কাশী থেকে শাস্ত্রের পাঠ নিয়ে আসা ছিল একই সঙ্গে সম্মান ও গৌরবের বিষয়। কাশীর এই শিক্ষাব্যবস্থা তাই অত্যন্ত গুণমানে সমৃদ্ধ ছিল। কাশীর শিক্ষা ব্যবস্থার মূলভিত্তি ছিল বিভিন্ন পণ্ডিতদের চেষ্টায় গড়ে ওঠা অসংখ্য দেশীয় শিক্ষার পাঠশালা। দেশীয় ঐতিহ্যের কেন্দ্র ছিল এই বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়গুলি। এই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে ছাত্ররা আসতেন। বারাণসীতে এসে একটি নির্দিষ্ট শাস্ত্র বা একাধিক শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতেন তাঁরা। পণ্ডিতগণ নিজের বাড়িতে যেমন বিদ্যালয় খুলে পাঠদান করতেন এবং নিজে ভরণপোষণ দিতেন ছাত্রদের তেমনই কাশীর ধনীশ্রেণীও এই পণ্ডিতদের ভরণপোষণ করতেন। তাদের অন্নবস্ত্রের চিন্তা যাতে শাস্ত্রচর্চায় ব্যাঘাত না ঘটায় সেই বিষয়ে তাঁরা সচেষ্ট থাকতেন। কাশী যখন মরাঠা রাজাদের অধীনে আসে তখন তাঁরা প্রচুর পরিমাণ টাকা খরচ করেন কাশীর শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিসাধনে। প্রায় এক লক্ষ টাকা তাঁরা কাশীর সংস্কৃত শিক্ষার জন্য মঞ্জুর করেছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অসংখ্য মঠ ও মন্দিরেও সংস্কৃত শিক্ষার বিদ্যালয় ইত্যাদি স্থাপন করে বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি ঘটান। এই মঠ, মন্দিরের আওতাধীন বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলি কাশীর সারস্বত চর্চার কেন্দ্র রূপে গড়ে ওঠে। সাম্প্রতিক অতীতে সারস্বত চর্চার কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করা এমন কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে আলোচনা করবো।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় :

ব্রিটিশেরা এদেশে আসার পর প্রথম দিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী না হলেও পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে সচেষ্ট হন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে কাশীতেও এই পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন ঘটে। পাশ্চাত্য শিক্ষার এই বিস্তার একদিকে যেমন নতুন দিগন্ত খুলে দেয় শিক্ষা ক্ষেত্রে অন্যদিকে তার সঙ্গে আসে পাশ্চাত্যদেশসুলভ মানসিকতা। এরপর স্বদেশী আন্দোলন ইত্যাদির মাধ্যমে দেশজ শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন ভারতবাসী। তারা দেশজ শিক্ষা বিস্তারের প্রতি ও উদ্যোগী হন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রথম সারির জাতীয়তাবাদী নেতা ও হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। তিনি দেশজ শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হন। তিনি ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপন করেন। কাশীর রাজা প্রভু নারায়ণ সিংহের দান করা জমিতে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ১৪০টি বিভাগ, ১৪টি অনুষদ্ (ফ্যাকাল্টি) আছে। দুটি ক্যাম্পাসে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন পাঠনের ব্যবস্থা হয়। অ্যানি বেসান্ত কর্তৃক হোমরুল আন্দোলনের সময় প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও পরবর্তীকালে এতে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম একটি অনুষদ্ হলো সংস্কৃত বিদ্যাধর্মবিজ্ঞান অনুষদ্। যেখানে পারম্পরিক রীতিতে শাস্ত্র শিক্ষাদান করা হয়। পণ্ডিত মালব্য প্রতিষ্ঠানটিতে ভারতীয় শিক্ষার সমস্ত রীতি অনুসরণ করেই শিক্ষার প্রবর্তন করেন। দেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁর ডাকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে আসেন এবং পরবর্তীকালে তাদের ছাত্ররাও অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে দেশের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই প্রতিষ্ঠান ক্রমশ কাশীর সারস্বত চর্চার অন্যতম কেন্দ্ররূপে পরিচিতি লাভ করে। পাশ্চাত্য শিক্ষার কাঠামোয় প্রাচ্য ধারার এই শিক্ষাদান পণ্ডিত মালব্যর দেশের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান। এছাড়া আয়ুর্বেদ অনুষদ্ও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে যা ভারতীয় পারম্পরিক চিকিৎসা ব্যবস্থার পাঠ দান করে আসছে অনেক দিন থেকেই। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাম্প্রতিক মূল্যায়ন অনুযায়ী, এই বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের মধ্যে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সর্বদা ১ থেকে ৫ নম্বর স্থানের অধিকারী একটি অন্যতম উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্র।

সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় :

এই কলেজের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে বিভিন্ন মত আছে। তবে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার পেছনে মূল উদ্যোগ অবশ্যই ব্রিটিশ সরকারের এতে কোনো সন্দেহ নেই। কাশীর স্থানীয় আবাসিক ব্রিটিশ প্রতিনিধি জোনাথন ডানকানের উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে ২৮ অক্টোবর কলেজ রূপে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি আত্মপ্রকাশ করে। প্রথাগত শিক্ষাধারায় সংস্কৃত শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এই বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানকাল পর্যন্তও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ব্যাকরণ, বেদ, মীমাংসা, বেদান্ত, আয়ুর্বেদ, ধর্মশাস্ত্র, ন্যায় ইত্যাদি শাস্ত্রচর্চার অনেক বিভাগ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে আছে। প্রতিটি বিভাগেই সুযোগ্য অধ্যাপকেরা উপযুক্ত পাঠদানের মধ্যে দিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উজ্জ্বল করেছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আর একটি উদ্দেশ্য ছিল ভারতের জ্ঞানভাণ্ডার যেই পাণ্ডুলিপির মধ্যে লিপিবদ্ধ সেই জ্ঞানভাণ্ডারের সংগ্রহ। তবে পাশ্চাত্য প্রথাগত শিক্ষার ধারায় সংস্কৃত শিক্ষার প্রচলন করলেও এই প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের রীতি সম্পূর্ণ ভারতীয়। শুধু পাঠদানই নয়,

পাঠের বিরতিও তাই। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে রবিবারে ছুটি থাকে যা কিনা মূলত খ্রিস্ট মতের অনুসারী বলে অনেকের অভিমত। কিন্তু এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শাস্ত্র মতে যেই দুটি তিথিতে বেদ পড়া নিষেধ সেই প্রতিপদ ও অষ্টমী তিথিতে ছুটি থাকে।

এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয় কাশীর সারস্বতচর্চার কেন্দ্র রূপে পরিচিত হলেও এই দুটি প্রতিষ্ঠান মূলত পাশ্চাত্য শিক্ষার কাঠামো অনুযায়ী স্থাপিত। এর বাইরে কাশীর সারস্বত প্রবাহের প্রাণ সংস্কৃত শিক্ষার পাঠশালাগুলি। দেশের সুপ্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা অনুসরণ করে এখনও এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান করা হয়। এই পাঠশালাগুলি মূলত মঠ, আশ্রম ইত্যাদি ধর্মীয় সংগঠনের দ্বারাই পরিচালিত। এরকম কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিদ্যালয় হলো :

শ্রীগুরুকার্ষ্ণিমঠ :

মূলত বৃন্দাবনের রমণরেতিতে তাঁদের মুল আশ্রম। পঞ্জাবের প্রসিদ্ধ উদাসীন সম্প্রদায়ের অধীন এই মঠ কাশীতে বর্তমানে শাস্ত্র পঠন পাঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যাবেলায় এখানে পণ্ডিতেরা শাস্ত্রের পাঠ দান করেন। শাস্ত্র অধ্যয়নের সুপরিবেশ এই মঠে বিদ্যমান। বহু ছাত্র এই মঠের শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা উপকৃত হয়ে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠরত। এটি কাশীর অন্যতম একটি সারস্বত কেন্দ্র।

দক্ষিণামূর্তি মঠ :

কাশীর মিশ্রপোখরা অঞ্চলে অবস্থিত এই মঠ বর্তমানে পুরীর শঙ্করাচার্যের অধীনে। এই মঠের সংস্কৃত শিক্ষা কেন্দ্রটি শুধু সংস্কৃত শিক্ষাদানেই নয় সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। মহেশানন্দ গিরি মহারাজের তত্ত্বাবধানে এই প্রতিষ্ঠান ১৯৬০ সাল থেকে বেদান্ত এবং অন্যান্য শাস্ত্রের গ্রন্থগুলিও প্রকাশ করেন। এই প্রতিষ্ঠান নিজের গ্রন্থগুণমানের জন্যও পণ্ডিত সমাজে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। বর্তমান শতকের শুরু থেকে আশির দশক পর্যন্ত বহু বড়ো পণ্ডিত এই মঠে পাঠদান করে এসেছেন। এই মঠ কাশীর সারস্বতসাধনার মানচিত্রে একটি প্রধানতম কেন্দ্র।

এছাড়াও কাশীর ঢুণ্ঢিরাজ গলির সন্ন্যাসী মহাবিদ্যালয়, রামঘাটে অবস্থিত বল্লভরাম শালিগ্রাম সাঙ্গবেদ বিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানও সুযোগ্য ছাত্র তৈরি ও অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর জন্য উল্লেখের দাবি রাখে।

কাশীর এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলি এখনও দেশীয় ঐতিহ্যগত শিক্ষাব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা এবং তাকে জনপ্রিয় করারও চেষ্টা করছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনেক অনেক সুযোগ্য অধ্যাপক এই সারস্বত কেন্দ্রগুলির থেকে শিক্ষা নিয়ে অধ্যাপনা করছেন। সুপ্রাচীনকাল থেকে চলে আসা কাশীর সারস্বত চর্চা এই মঠ ও মঠের অধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য এখনও বিদ্যমান। আজ এই প্রতিষ্ঠানগুলির জন্যই কাশী ভারতের সারস্বতচর্চার প্রধান পীঠস্থানে পরিণত হয়েছে।

(লেখক সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসীর ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা কেন্দ্রের গবেষক)

টেবিল টেনিসে সাফল্য বঙ্গতনয়ার

নিলয় সামন্ত

বাঙ্গালি কন্যা ঐহিকা মুখোপাধ্যায় ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে কোমরে গুরুতর চোট পান। উঠে দাঁড়ানো তাঁর পক্ষে কষ্টকর ছিল। খেলা তো দূর অস্ত। সেই জায়গা থেকে প্রত্যাবর্তন করে গত বছরই কেরিয়ারের সেরা পর্যায়ে পৌঁছে যান ঐহিকা মুখোপাধ্যায়। পান অর্জুন পুরস্কার। তার থেকেও বড়ো বিষয়, বুসানে বিশ্ব টেবিল টেনিস টিম চ্যাম্পিয়নশিপে কেরিয়ারের সেরা জয় তুলে নেন। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব র‌্যাঙ্কিঙে শীর্ষস্থানে থাকা চীনের সান ইয়েংশাকে হারান পশ্চিমবঙ্গের এই টেবিল টেনিস খেলোয়াড়। বিশ্বের একনম্বর প্যাডলারের বিরুদ্ধে সাফল্যের রহস্য ফাঁস করলেন তিনি। কলকাতায় ফিরে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি বিকেলে ধানুকা ধানসিঁড়ি সৌম্যদীপ-পৌলমী টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমির পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধিত করা হলো। বর্তমানে দেশের দুই অর্জুন টিটি খেলোয়াড়ের অ্যাকাডেমিতেই অনুশীলনরত ঐহিকা। বুসানে সাফল্যের পুরস্কারস্বরূপ তাঁর হাতে এক লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন অ্যাকাডেমির কর্ণধার অতুল ধানুকা। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ঐহিকার সতীর্থ সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়। ছিলেন সৌম্যদীপ রায় ও পৌলমী ঘটকও। বিশ্বমঞ্চে সেরা টিটি খেলোয়াড়কে হারানোর অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন ঐহিকা। জানান যে তিনি নিজেই একনম্বর প্যাডলারের মুখোমুখি হতে চেয়েছিলেন। বরাবরই চ্যালেঞ্জ নিতে ভালোবাসেন। ম্যাচে পিছিয়ে পড়ার পর মনে মনে ভেবেছিলেন, বিশ্বের একনম্বর খেলোয়াড়ও মানুষ। তাঁরও দুটো হাত রয়েছে। শেষমেষ হাল না ছাড়ার পুরস্কার মেলে। ঐহিকা বলেন, 'ম্যাচের আগের দিন রাতের মিটিঙে আমি বলেছিলাম যে আমি সান ইয়েংশার বিরুদ্ধে খেলতে চাই। তারপর আমাকে ডি গ্রুপে রাখা হয়। ওর বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ পেয়ে খুবই খুশি হয়েছিলাম। একটুও ঘাবড়ে যাইনি। আমি বরাবরই চ্যালেঞ্জ নিতে ভালোবাসি। আমার থেকে যারা ভালো, তাঁদের বিরুদ্ধে খেলতে চাই। খুশি হয়ে প্র্যাকটিস শুরু করি। ডাবলসে চীনের খেলোয়াড়দের আত্মবিশ্বাস বাড়ে। সানের বিরুদ্ধে ম্যাচের শুরুতে আমি কিছু পয়েন্ট পাই। দ্বিতীয় গেম হেরে যাই। আবার তৃতীয় গেম জিতি। তারপর ভাবলাম যাই হোক না কেনো, শেষ পর্যন্ত লড়াই করব। শেষ পর্যন্ত আমি ম্যাচটা জিতে যাই।'

বিশ্বমঞ্চে ভারতের মেয়েদের দলগত সাফল্য প্যারিস অলিম্পিকের দরজা প্রায় খুলে দিয়েছে। ৫ মার্চ অলিম্পিকে সুযোগ পাওয়ার খবর ঘোষণা। তবে আনঅফিশিয়ালি টিম হিসেবে ভারতের খেলা নিশ্চিত। প্রি-কোয়ার্টারে পৌঁছনোর জন্য বিশ্ব ক্রমপর্যায়ে ওপরে উঠে আসায় অলিম্পিকের টিকিট মিলবে। তবে ভারতীয় দলের হয়ে কারা প্রতিনিধিত্ব করবে, সেটা এখনও নির্দিষ্ট হয়নি। মণিকা বাত্রা, সৃজা আকুলা এক প্রকার নিশ্চিত। আরও দুটো স্পট খালি আছে। সামনে দুটো টুর্নামেন্ট আছে। সেখানে ভালো পারফরম্যান্সের ওপর নির্ভর করবে ভারতীয় দলে সুযোগ পাওয়া। সেসব নিয়ে অবশ্য ভাবতে চান না ঐহিকা। সামনেই সিঙ্গাপুর ওপেন। সুতীর্থার সঙ্গে আবার জুটি বেঁধে খেলবেন। আপাতত সেদিকেই ফোকাস। তবে প্যারিস অলিম্পিকের টিকিট পাওয়ার বিষয়ে আশাবাদী। ঐহিকা বলেন, 'অলিম্পিকের দল ঘোষণার পর প্রস্তুতি শুরু হবে। অবশ্যই আলাদা প্রস্তুতি নিতে হবে। ডব্লিউটিটি টুর্নামেন্ট খেলে যেতে হবে। স্ট্রেংস্থ, পাওয়ারে উন্নতি করতে হবে। টিম জানার পর সূচি পরিবর্তন করব। ৪-৫ মার্চ ঘোষণা হওয়ার কথা। অঙ্ক অনুযায়ী আমরা কোটা পেয়ে গিয়েছি। টিটিএফ দল বাছাই করবে। দলে জায়গা পেলে অলিম্পিক থেকে পদক আনার চেষ্টা করব'।

অলিম্পিকের জন্য বিদেশি কোচের দিকে ঝুঁকতে চান না ঐহিকা। ভরসা রাখতে চান সৌম্যদীপ-পৌলমীর ওপর। ঐহিকা বলেন, 'আমাদের কোচরা খুব ভালো গাইড করছেন।'। মার্চের শুরুতেই সিঙ্গাপুর পাড়ি দেবেন টুর্নামেন্ট খেলতে। তার আগে বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাতে চান। খেলা না থাকলে এভাবেই সময় কাটান সেরেনা উইলিয়ামসের ভক্ত। বাবা গৌতম মুখোপাধ্যায় যখন কার্গিলে ছিলেন তখন থেকেই টেবিল টেনিসে যাত্রা শুরু ঐহিকার। নৈহাটির মিহির ঘোষ অ্যাকাডেমিতে পথ চলা শুরু ছোট্ট ঐহিকার। এখন অলিম্পিকের পদক জয়ের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন।

হ্যাঁ, চোট পেয়ে খেলা ছেড়ে দেওয়ার কথা চিন্তা করা ঐহিকা যদি সেদিন সত্যি টিটি ব্যাট তুলে রাখতেন, তাহলে আজ বাঙ্গালি পেত না একজন অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত প্যাডলারকে। শুধু তাই নয়, ইতিহাসে নাম লিখে ফেলা ঐহিকা এখন সারা দেশে চর্চার বিষয়। কারণ, বিশ্বের এক নম্বর ক্রমতালিকায় থাকা চীনের সান ইয়েংশাকে হারিয়েছেন তিনি। বলেন, 'ছোটোবেলায় চেহারাটাও একটু ভারী ছিল। আমাকে ফিট রাখার জন্য টিটিতে ভর্তি করানো হয়েছিল। তখন কী আর এই সব কথা ভেবেছি?' আরও বললেন, 'আমি বরাবর সেরা খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে খেলতে ভালোবাসি। এশিয়ান গেমসের পদকের কথাটা আমার মাথায় ঘুরছিল তখন। চীনের বিরুদ্ধে সেখানে আমরা জিতেছিলাম'। অলিম্পিকে কী হবে এখনও জানে না। তবে অলিম্পিকের কথা মাথায় না রেখে নিজের প্রস্তুতিতে ডুবে থাকতে চান ঐহিকা। এদিন ধানুকা ধানসিঁড়ি সৌম্যদীপ-পৌলমী টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমির পক্ষ থেকে তাঁকে এই সাফল্যের জন্য সম্মানিত করা হলো। সঙ্গে তিনি পেলেন এক লক্ষ টাকা। □

সুস্থ সমাজ গঠনে মায়ের ভূমিকা

সুতপা ভড়

সংবাদপত্র, দূরদর্শন, ইন্টারনেট সর্বত্র দেখা যায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক অপরাধ সমান্তরালভাবে বেড়ে চলেছে। দুশ্চিন্তার বিষয় হলো এইসব অপরাধে শিশু, বালক-বালিকা, কিশোর- কিশোরী থেকে শুরু করে বয়স্করাও সামিল হচ্ছেন অথবা হয়েছেন। আর্থিক স্বচ্ছলতা সমাজে এসেছে। আমরা পরীক্ষা দিয়ে গুটিকতক ডিগ্রি উপার্জন করে নিজেদের শিক্ষিত বলে বুক ফুলিয়ে পরিচয় দিয়ে বেড়াচ্ছি। কিন্তু সত্যিই কি আমরা সভ্য, ভদ্র হতে পেরেছি? যদি পারতাম তাহলে চারদিকে নানারকম বিকৃতমনের পরিচয়বহনকারী অপরাধ কি ঘটত? কেন মেয়েরা বাড়ির বাইরে বেরোলে আমরা চিন্তাগ্রস্ত হই। এই সমস্যার জন্য দায়ী কে? মেয়েদের সাধারণত মা, কাকিমা, ঠাকুমা, দিদিমারা উঠতে বসতে, আকারে ইঙ্গিতে নানারকম শিক্ষা দিয়ে থাকেন। কীভাবে চলা, বসা, কথা বলা, খাবার পরিবেশন করা, অতিথি সৎকার করা, রুচিসম্মত পোশাক পরা—এগুলো পড়াশুনোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঘরে ঘরে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। আমরা বিশ্বাস করি মেয়েদের যদি সুশিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলে তারা পরবর্তী জীবনে দুটি পরিবারকে সুখে রাখতে এবং নিজেরাও সুখে-শান্তিতে অতিবাহিত করতে পারবে। একটু ভাবুন তো, বাড়ির ছেলেদের পড়াশুনোর কথা ছাড়া আনুষঙ্গিক পারম্পরিক শিক্ষা কতগুলি বাড়িতে দেওয়া হয়? অথচ পরিবারের সবথেকে ভালো জিনিসটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা পুত্রসন্তানের জন্য রেখে দিই।

অঙ্গনা

এজন্য মায়েদের বেশি পরিমাণে সজাগ হওয়া জরুরি। ছেলেদের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদেরও সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার প্রয়োজন এটা অনুভব করে তার প্রয়োগ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রস্তাব রাখছি— (১) কুরুচিপূর্ণ সিনেমা, দূরদর্শনের অনুষ্ঠান আমরা যেন পারিবারিক তথা সামাজিক ভাবে বয়কট করি।

(২) কমপিউটার গেমে পাত্র-পাত্রীদের উত্তেজক পোশাক ও হিংস্রতা থেকে যেন শিশুদের দূরে রাখি। কমপিউটার বাড়িতে এমন জায়গায় রাখতে হবে যাতে শিশুদের ক্রিয়াকলাপ আমাদের নজরে থাকে। কমপিউটারের সাধারণ জ্ঞান আমাদেরও রাখা উচিত— এ ব্যাপারে সন্তানরাই আমাদের শিক্ষক/শিক্ষিকা হতে পারে।

(৩) সন্তানের ইন্টারনেট ব্যবহারে কঠোরভাবে নজর রাখা দরকার। কেননা ইন্টারনেট যেমন জ্ঞানের সমুদ্র, তেমনি আপনার সন্তানকে অতল গহ্বরে নামিয়ে দিতে পারে।

(৪) আমরা যেন শিশুদের সঙ্গে মোবাইল ফোনের ব্যবহার- অপব্যবহার দুটোই আলোচনা করি এবং উচিত কাজে তাদের উৎসাহিত করি।

(৫) সন্তানের চব্বিশ ঘণ্টার ক্রিয়াকলাপ যেন আমাদের নখদর্পণে থাকে। তাদের পড়াশুনোর দেখাশুনো মায়েদের করাই ভাল। শিশুদের বিদ্যালয়/কোচিং সংস্থার শিক্ষক-শিক্ষিকা, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সহজ সরল সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে, এর মাধ্যমে আমরা আমাদের সন্তানদের গতিবিধির খবর পেতে থাকব।

(৬) বন্ধুর মতো মিশতে হবে নিজের সন্তানের সঙ্গে। তাদের পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, পঞ্চতন্ত্রের গল্প বলতে হবে। নিজের প্রয়োগাত্মক অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, শিশুরা এবং বড়রা সবাই মন দিয়ে এগুলো শুনতে চায়। শুধু তাই নয়, নিজেদের মধ্যে ওই চরিত্রগুলিকে খোঁজার চেষ্টা করে।

(৭) সন্তানের মধ্যে ভালো বই পড়ার অভ্যেস তৈরি করতে হবে। মহাপুরুষদের জীবনী, ভ্রমণকাহিনি, রামায়ণ, মহাভারত যেন তারা অবশ্যই পড়ে। কারণ এগুলির মধ্যেই তারা জীবনের জটিলতাকে সহজ-সরল করে তোলার দিশা খুঁজে পাবে।

(৮) ছেলে-মেয়েদের শারীরিক ব্যায়াম জরুরি— আমরা মায়েরাও যেন মাঝে মাঝে তাদের খেলার সঙ্গী হই, এতে আমরা ওদের মনের অনেক কাছে পৌঁছে যাব।

(৯) ওদের দায়িত্ব দিন— তবেই ওরা দায়িত্বশীল হয়ে উঠবে, ভালো কাজের দায়িত্ব নেবে আর খারাপ কাজ থেকে এই দায়িত্ববোধই ওদের দূরে রাখবে।

(১০) সর্বোপরি 'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখাও'— নীতি যেন আমরা মায়েরা অনুসরণ করি; কারণ আমরা যেমন, আমাদের সন্তানরাও তেমন হবে। আমগাছে আমই হয়। সেজন্য আমাদের মায়েদের নিজেদের কাজ ও ভাবনায় স্বচ্ছতা আনতে হবে সবার আগে। যে কাজগুলি আমরা আমাদের সন্তানদের থেকে প্রত্যাশা করি, সেগুলি যেন সর্বাগ্রে নিজেরা পালন করি।

ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং মহানপুরুষদের জীবন থেকে প্রেরণা নিয়ে আমরা মায়েরা যেন নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করি। এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ মায়ের সুসন্তানরাই গড়ে তুলবে সুস্থ-সুন্দর সমাজ, যার জন্য সমগ্র বিশ্বে ভারতবর্ষের স্থান পুনরায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। ■

বক ও কাঁকড়া

নানা জাতের ছোটো বড়ো মাছ ছিল এক বিশাল জলাশয়ে। অনেক জলচর প্রাণীও থাকত সেখানে। জলাশয়ের পাশেই ছিল বিশাল এক বটগাছ। সেখানে বাস করত এক বুড়ো বক।

শিকার করার মতো তার ক্ষমতা ছিল না। বেশিরভাগ দিন তাকে না খেয়ে থাকতে হতো।

একদিন অনেক কষ্টে জলাশয়ের ধারে এসে বকটি বসল। খিদের জ্বালায় তার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। একটি কাঁকড়া দূর থেকে তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কাঁদছ কেন? বক বলল সাধে কী আর কাঁদছি। তোমাদের কথা ভেবে দুঃখে চোখ থেকে জল পড়ছে।

ইতিমধ্যে আরও কাঁকড়া এসে পড়েছে। বুড়ো কাঁকড়া বলল, কেন আমাদের আবার কী হলো? বক বলল, শুনলাম, কদিন পরে ভীষণ খরা শুরু হবে। আর তা চলবে বারো বছর ধরে। তখন এই জলাশয়ে ছিটেফোঁটা জলও থাকবে না। তোমরা তো ছটফট করে মরে যাবে।

এমন সর্বনেশে কথা শুনে কাঁকড়ার দল ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। কাঁকড়া দেখল এইতো সুযোগ। সে বানিয়ে বানিয়ে বলতে লাগল, এর মধ্যেই খবরটা পাঁচকান হয়ে গেছে। যে যার পরিবার পরিজন সহ যেখানে বেশি জল আছে সেখানে পালিয়ে যাচ্ছে। এমনকী কুমির জলহস্তীরাও চলে গিয়েছে। একলা পড়ে আছো তোমরা আর ওই মাছেরা।

কাঁকড়ার দল খবর দিল মাছ আর কচ্ছপদের। তারা সবাই এসে হাজির হলো বকের কাছে। বক বলল, আমি একটা কাজ করতে পারি। ওই দূরে আর একটা বড়ো জলাশয় আছে। বুড়ো হলেও আমি তোমাদের আমার পিঠে করে ওই জলাশয়ে রেখে আসতে পারি।

বকের কথা সবার মনে ধরল। সবার আগে এগিয়ে এল মাছেরা। বক মনে মনে খুশি হলো। এই পরম ক্ষণটির জন্য সে অপেক্ষা করছিল। বলল, বেশ কাল ভোর থেকেই কাজ শুরু হবে।

কথামতো কাজ শুরু হলো। বক এক-একটি মাছ ঠোঁটে করে নিয়ে যায় খানিক দূরে। তারপর পাথরে আছড়ে মেরে খেয়ে ফেলে। এভাবেই দিন কেটে যাচ্ছে বকের। এখন আর খাবারের জন্য চিন্তা করতে হয় না। অতি সহজেই খাবার মুখের সামনে পেয়ে যাচ্ছে। বকের এই ফন্দির কথা জলাশয়ের কেউ টের পেল না।

কয়েকদিন পর কাঁকড়া বকের কাছে এসে বলল, আমাদের ফেলে অন্যদের আগে নিয়ে যাচ্ছ। আমরা তো সবংশে মারা পড়বো। বক দেখল, শুধু মাছ খেয়ে খেয়ে মুখে অরুচি এসে গেছে। এবার স্বাদ বদলানো দরকার। সে বলল, আজ তোমাকে নিয়ে যাবো, আমার পিঠে বসো। তারপর কাঁকড়াকে নিয়ে উড়ে চলল।

বক যেখানে বসে মাছ খেত, সেই জায়গাটায় আসতেই কাঁকড়া লক্ষ্য করল, আশেপাশে মাছের কাঁটা ছড়িয়ে পড়ে আছে। কাঁকড়া বলল, আর কতদূর ভাই? বক ভাবল, এখন তো কাঁকড়া আমার ক্ষতি করতে পারবে না। তাই কুটিল হাসি হেসে বলল, জলাশয়-টলাশয় কিছু নয়। আমি বুড়ো হয়েছি, শিকার করার ক্ষমতা আমার নেই, তাই চালাকি করে জলাশয়ের সবাইকে আমার পেটে চালান করেছি। এবার তোমার পালা।

বকের কথা শুনে কাঁকড়ার বুক ধড়াস করে উঠল। মৃত্যুভয়ে ভীত হলেও বুদ্ধি হারালো না। সে এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে তার শক্ত দাঁড়া দিয়ে বকের গলাটা চেপে ধরল। একটু জোরে চাপ দিতেই বকের মাথাটা ধড় থেকে আলাদা হয়ে গেল।

কাঁকড়া বকের মাথাটি তার শক্ত দাঁড়ায় চেপে ধরে সেই জলাশয়ে ফিরে এল। জলাশয়ের বাকি সবাই ছুটে এল। বক সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে তাদের বলল, মিষ্টিকথা বললেও কখনোও শত্রুকে বিশ্বাস করতে নেই।

সংগৃহীত

নদ-নদী পরিচয়

তোর্ষা

পূর্ব তিব্বতের চুম্বি উপত্যকার টাং পাস থেকে উৎপন্ন হয়ে তিব্বত, ভুটান, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। তিব্বতে এর নাম চুম্বি এবং ভুটানে নাম আমো ছু। পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার হয়ে অসমের ধুবড়ির প্রায় ২৩ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে বাংলাদেশে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। কোচবিহারের ২৯ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে রায়ডাক নদীর একটি শাখা তোর্ষানদীতে মিশেছে।

এসো সংস্কৃত শিখি– ১৪

অত্র,তত্র,কুত্র ? অন্যত্র, সর্বত্র, একত্র (এখানে, সেখানে, কোথায় ? অন্য কোথাও, সব স্থানে, এক স্থানে)

লেখনী কুত্র অস্তি ?– কলম কোথায় আছে ?

লেখনীঅত্র অস্তি। –কলম এখানে আছে।

অভ্যাস করি–

পুস্তকং কুত্র অস্তি ?–পুস্তকং অত্র অস্তি।

কূপী কুত্র অস্তি ?–কূপী অত্র অস্তি।

দ্রোণী কুত্র অস্তি ?– দ্রোণী অত্র অস্তি।

চষকঃ- - অস্তি ?–চষকঃ অত্র অস্তি।

চমসঃ- - ? চমসঃ - - ।

দ্বারং - - ? দ্বারং - অস্তি।

ভালো কথা

হরিণালয়ে

কদিন থেকেই আমাদের শাখায় বলা হচ্ছিল, বালকদের হরিণালয় দেখাতে নিয়ে যাওয়া হবে। সেইমতো ১০ ফেব্রুয়ারি সকালে আমরা ১৯ জন রওনা হলাম। সঙ্গে অবশ্য বড়োরাও ছিলেন। আমরা আকাঙ্ক্ষা বাসস্টপে নেমে একটু হেঁটে হরিণালয়ে পৌঁছালাম। হরিণালয়ের কর্মী দেবাশিসদা আমাদের ভেতরে নিয়ে গেলেন। তারপর ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগলেন। আমরা আমাজন তোতা, রেডটেইলড তোতা, আরও বিভিন্ন পাখি, গোল্ডেন শেড মাংকি, লং টেইলড মাংকি, কুমির, জলহস্তী, জিরাফ, জেব্রা, বিভিন্ন জাতের হরিণ দেখলাম। এরমধ্যেই দেবাশিসদা আমাদের সবাইকে ফ্রুটি খাওয়ালেন। দুপুর হয়ে যাওয়ায় আমরা একটি গাছের নীচে বসে নিজের নিজের সঙ্গে আনা খাবার সবার সঙ্গে ভাগ করে খেলাম। তারপর ক্যুইজ, অন্ত্যাক্ষরী হলো। ইতিমধ্যে ফরেস্ট অফিসার বিবেক ওঝা এবং কয়েকজন কর্মী আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আবার সবাইকে মশলা দই খাওয়ালেন। আমাদের সঙ্গে ফোটো তুললেন। কেমন লাগল তা জিজ্ঞাসা করলেন। শেষে নিজের গাড়ি করে আমাদের বাড়ি পৌঁছে দিলেন। হরিণালয় ছোটো হলেও ফরেস্ট অফিসারের আন্তরিকতায় সেদিন আনন্দ উপভোগ করেছিলাম।

নীল শূর, **নবম শ্রেণী, বলাই সিংহ লেন, কলকাতা-৬।**

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

আবার শীত

পৃথা সেন, ষষ্ঠ শ্রেণী, ঝালদা, পুরুলিয়া।

পাখা চলে বন বন
বাপরে কী গরম
হঠাৎ উধাও গরম
একেবারে নরম।
সোয়েটার আলোয়ান
তুলে রাখা ছিল
গরমের চোটে তার
প্রয়োজন না ছিল।

হঠাৎ আকাশে মেঘ
ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি
আবার শীত এসে গেল
এ কী অনাসৃষ্টি।
মাঘের শীতের মতো
উত্তুরে হাওয়া
মজা করে আলোয়ান সোয়েটার
ফের গায়ে দেওয়া।

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব
কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

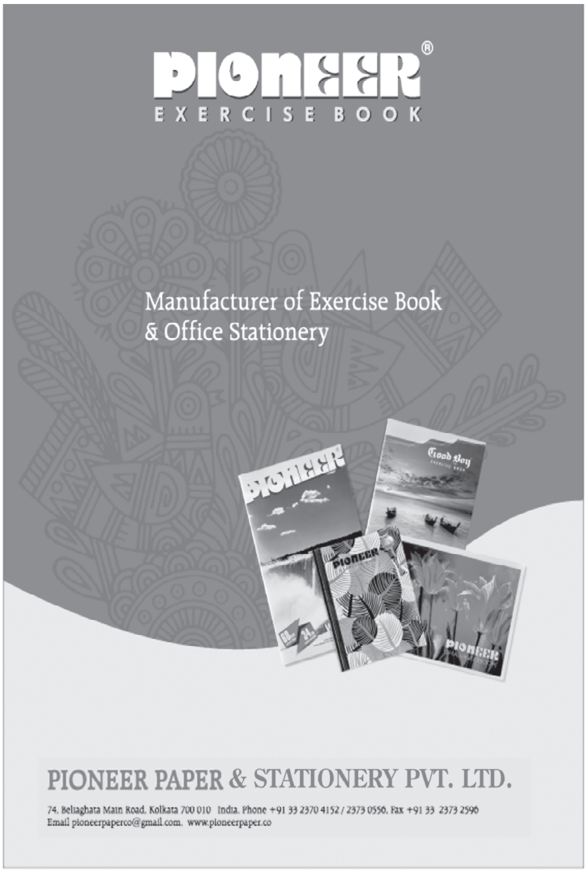

With Best Compliments from -

A

Well wisher

রামচরণ পাদুকা থেকে জয় শ্রীরাম ঘণ্টা

রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠায় ভক্তদের প্রাণঢালা উপহার

দুর্গাপদ ঘোষ

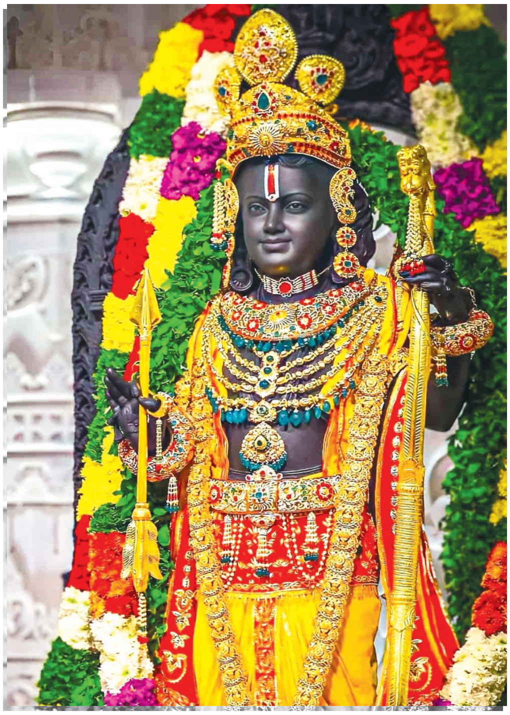

ভক্তি এমন এক শক্তি যা আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় না। কিন্তু তার আকর্ষণ কেবল প্রবল নয়, অসাধারণ এবং অসীম। চুম্বকের আকর্ষণ যেমন দৃশ্যমান নয় কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার অস্তিত্বের এবং শক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়, ভক্তিও তেমনি দৃশ্যমান নয় কিন্তু তার আকর্ষণ বা টান যে কী বিপুল গত ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামলালার বিগ্রহে প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় তাঁর প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলেছে। ভক্ত যখন তাঁর ভগবানের দিকে আবেগাপ্লুত হয়ে ছুটে যান, কী করবেন, কী বলবেন, অন্তরাত্মার সমস্ত বাসনা কীভাবে উজাড় করে দেবেন কিংবা আরাধ্যের চরণে কীভাবে কী নিবেদন করবেন তার সীমা পরিসীমা থাকে না তখন তাকে কী ভাষায় ব্যক্ত করা যাবে— আকর্ষণের শক্তি না মহাশক্তি! যে শব্দই ব্যবহার করা হোক না কেন, অন্তর্নিহিত সেই 'ভাব'-এর প্রকাশ সে কোনো ভাবেই পরিপূর্ণ করা যায় না। কোন টানে, কোন আকর্ষণ 'পঙ্গুর্লঙ্ঘয়তে গিরিম্' সে কেবল পঙ্গুই জানে। কিংবা হয়তো তিনি নিজেও জানেন না। যেমন জানেন না দক্ষিণ ভারতের হায়দরাবাদ থেকে নগ্ন পায়ে অযোধ্যায় হেঁটে আসা চারলা শ্রীনিবাসন শাস্ত্রী।

শ্রীরামচরণ পাদুকা : শ্রীনিবাসন কেবল যে নগ্ন পায়ে ১ হাজার ৩০০ কিলোমিটার পথ হেঁটে এসেছেন তাই নয়, পরম ভক্তিতে মাথায় করে এনেছেন তাঁর তৈরি করানো এক জোড়া ভারী পাদুকাও (খড়ম)। তাঁর নিজের কথায় 'শ্রীরামচরণ পাদুকা।' যার এক-একখানার ওজন ৮ কিলোগ্রাম করে। রুপোর ওপর সোনার জল করা প্রায় ৪ কেজি ওজনের একখানা থালার ওপর সেই পাদুকা জোড়া রেখে, ফুল, চন্দনাদিতে সাজিয়ে গত বছরের (২০২৩) ২৮ অক্টোবর বেদুরপাকা গ্রাম থেকে পদযাত্রা শুরু করেন। লক্ষ্য ছিল প্রতিদিন গড়ে ২৮ কিলোমিটার পথ হাঁটতে হাঁটতে রামলালার বিগ্রহে প্রাণ প্রতিষ্ঠার কয়েকদিন আগেই যাতে পৌঁছে যেতে পারেন। সব মিলিয়ে ২০ কেজিরও বেশি ভারকে পরম ভক্তিতে মাথার মণি করে ৬ জানুয়ারি চলে আসেন অযোধ্যা থেকে ২৮০ কিলোমিটার দূরে রামচন্দ্রের স্মৃতি বিজড়িত অন্যতম প্রধান রামতীর্থ চিত্রকূট। দৃষ্টি আকর্ষণকারী নকসাখচিত পাদুকা জোড়া আগে ছিল কেবল রুপোর। সে দুটোকে নিয়ে তখন তিনি ব্রিটেন, দুবাই, মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুরে গিয়ে পদযাত্রা করেছিলেন।

মানুষের আগ্রহ ও ভক্তি দেখে যার পর নাই আবেগাপ্লুত হয়েছেন। অযোধ্যায় নিয়ে আসার আগে রামভক্তির টানে পাদুকা জোড়া হায়দরাবাদ শহরে নিয়ে গিয়ে তার ওপর সোনার আস্তরণ বসিয়ে নেন। চিত্রকূটে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার হাজার হাজার ভক্ত একের পর এক অনুষ্ঠান করে স্বাগত জানান। বিশাল শোভাযাত্রাও করা হয়। চিত্রকূটের ভরত কূপ থেকে আরও একজোড়া চরণ পাদুকার শোভাযাত্রা তার সঙ্গে যুক্ত হয়। দু' জোড়া চরণ পাদুকাকে একসঙ্গে পূজার্চনা, মঙ্গলারতি ইত্যাদির মাধ্যমে অসংখ্য মানুষ শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে দ্রবীভূত হয়ে যান। উভয় চরণ পাদুকাই শ্রীরামজন্মভূমিতে এসে পৌঁছায় ১৮ জানুয়ারি। সেদিনই আরও একজোড়া চরণ পাদুকা আসে শ্রীলঙ্কা থেকে। সেগুলো অবশ্য রামচন্দ্রের নয়, মায়ের। স্থানে স্থানে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদিত হতে হতে অযোধ্যায় এসে পৌঁছাতে সময় লাগে ৪৪ দিন। আরাধ্যের প্রতি ভক্তির টান কতখানি প্রবল হলে এরকমটা হতে পারে চরণ পাদুকা নিয়ে এইসব পদযাত্রা তার বিশেষ উদাহরণ হিসেবে ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে সন্দেহ নেই।

অর্থ দান : রামলালার বিগ্রহে প্রাণ প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে কেবল এই ভারতবর্ষই নয়, সারা বিশ্বের অন্তত ৫৬ টা দেশ কীরকম রামময় হয়ে গিয়েছিল সে অভিজ্ঞতা অনেকেরই হয়েছে। দেশ-বিদেশ থেকে বালক রামচন্দ্রের জন্য বহুবিধ এবং বহু বিচিত্র উপহার ও দান সামগ্রী এসেছে। দেশের মধ্যে ব্যাংক চেক, ব্যাংক ড্রাফ্‌ট এবং কোটি কোটি টাকার নগদ অর্থ নিবেদিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। ২৩ জানুয়ারি, যেদিন থেকে সর্বসাধারণের জন্য পুনর্নির্মিত রামজন্মভূমি মন্দিরের দ্বার উন্মোচন করে রামলালাকে দর্শন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে সেদিন থেকে ভক্ত-দর্শনার্থীদের ঢল বয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে মন্দির পরিসরে রাখা চার-চারটে দানপাত্রে ভক্ত ও দর্শনার্থীরা অন্তর উজাড় করে নগদ অর্থাদি দান করে যাচ্ছেন। প্রথম দিনই দর্শন করেন প্রায় ৭ লক্ষ শ্রদ্ধালু এবং কেবলমাত্র সেদিনই নিবেদিত হয় ৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। সেই থেকে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২ লক্ষের মতো তীর্থযাত্রীর আগমন ঘটছে এবং শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদিত হচ্ছে। তাছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ট্রাস্টের

ফঃ৬

হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে অর্থ ও অন্যান্য দানসামগ্রী। এমনকী রাজনৈতিক দলও বাদ নেই। উদাহরণ, একনাথ শিণ্ডের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা তাদের দলের তহবিল থেকে ১১ কোটি টাকার চেক তুলে দিয়েছে শ্রীরামজন্মভূমি কর্তৃপক্ষের হাতে। দান সামগ্রী যেমন প্রচুর জায়গা নিয়ে গড়ে তোলা দান ভাণ্ডারে রাখা হচ্ছে তেমনি নগদ অর্থ, চেক, ড্রাফট ইত্যাদি সব জমা করা হচ্ছে ট্রাস্টের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে।

কিন্তু যা সবাইকে বিস্ময়াভিভূত করেছে এবং করছে তাহলো নানাবিধ দ্রব্য এবং নানা ধরনের সৃষ্টি। যার কিঞ্চিৎ বিবরণ শুনেও লোকে বেবাক তাজ্জব বনে যেতে পারেন। সমস্ত কিছুর কথা কিংবা বিবরণ তুলে ধরা যে সম্ভব নয় এটা সকলেই অনুমান করতে পারছেন। এই নিবন্ধে আপাতত কয়েকটার কথা যথাসম্ভব সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা হচ্ছে। বারান্তরে হয়তো আরও কিছুর কথা তুলে ধরা সম্ভব হতে পারে।

রাম ধূপ : বহু প্রতিক্ষিত রামলালার পূজারতি বলে কথা! ভক্তদের কাছ থেকে রাশি রাশি ধূপকাঠির প্যাকেট আসবে এতো সবার জানা। কিন্তু এমন একটা 'ধূপকাঠি' সমর্পিত হয়েছে যা সাধারণ মানুষের ধারণার বাইরে ছিল। প্রাণ প্রতিষ্ঠার এক সপ্তাহ আগে ৮ জানুয়ারি সেই ধূপকাঠির যাত্রা শুরু হয় গুজরাট থেকে। তা কেবল ১০৮ ফুট লম্বা এবং সাড়ে ৩ ফুট বেড়ের মোটা তাই নয়, পুড়তে থাকলে তার চারদিকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত মন মাতানো সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়বে। ৩ হাজার ৬১০ কিলোগ্রাম ওজনের অকল্পনীয় এই 'ধূপকাঠি' বানিয়ে অযোধ্যায় পাঠিয়েছেন ভাদোদরার কয়েকটা কৃষক পরিবার। তৈরি করতে সময় লেগেছে ৬ মাসেরও বেশি। বানানো হয়েছে গোবর, খাঁটি ঘি, চন্দন কাঠের গুঁড়ো এবং বিভিন্ন সুগন্ধী ফুলের গুঁড়ো ও নির্যাস দিয়ে। এই ধূপকাঠির অন্যতম বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এর এক এক রকমের সুগন্ধ আলাদা আলাদা ভাবে অনেকক্ষণ ধরে ছড়াতে থাকবে। যেমন কিছুক্ষণ ধরে ছড়াবে চামেলির গন্ধ, কিছুক্ষণ চন্দনের, কিছুক্ষণ চাঁপা ফুলের, কিছুক্ষণ জুঁইয়ের, কিছুক্ষণ বেলফুলের ইত্যাদি। এই সঙ্গে জানিয়ে রাখা যেতে পারে যে মঙ্গলারতির সময় কর্পূর দরকার হয়। এজন্য গুজরাটের এক ভক্ত ১০০ কেজি কর্পূর দান করেছেন।

রাম হালুয়া : কোনো কিছু অতি বড়ো বা অস্বাভাবিক কিংবা অতি উত্তম হলে আমরা তার আগে 'রাম' শব্দ ব্যবহার করে থাকি। যেমন রামশিঙা, রামদা ইত্যাদি। দশরথ নন্দনের মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে আর হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ দর্শার্থী, ভক্তজনেরা অতি সুস্বাদু হালুয়া খেয়ে তৃপ্ত হবেন না তা তো হতে পারে না। কিন্তু সে তো আর দু-পাঁচ কেজির ব্যাপার নয়। হাজার হাজার কিলোগ্রামের ব্যাপার। কে বানাবেন সেই হালুয়া আর কিসেই বা বানাবেন! তবে ভক্তের আরাধ্যদেবের কাজ কখনো আটকে থাকে না, থাকতে পারে না। বিশেষ করে যাঁর বিগ্রহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষ শত শত বছর ধরে সংগ্রাম করে এসেছেন। এগিয়ে এলেন নাগপুরের স্বনামধন্য রাঁধুনি বিষ্ণু মনোহর। প্রতিদিন যাঁর হাতের 'তড়কা' খেয়ে হাজার হাজার মানুষ ধন্য ধন্য করে থাকেন। দৈত্যের মতো বিশাল একখানা ট্রাকের ট্রেলারের ওপর তাঁর ১ হাজার ৪০০ কিলোগ্রাম ওজনের ইস্পাতের কড়াই নিয়ে চলে এলেন অযোধ্যায়। সেই সঙ্গে লোক-লস্কর, ডাব্বা হাতা, বিশাল লম্বা খুন্তি ইত্যাদি। ১০ ফুট ব্যাস বা প্রায় ৩০ ফুট বৃত্তের সেই কড়াইকে ট্রাকে তুলতে নামাতে দরকার হয় ক্রেনের। রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার দিনক্ষণ ঘোষণা হতেই মনোহর ঠিক করলেন রামচন্দ্রের প্রতি তাঁর ভক্তির অর্ঘ্য হিসেবে অন্তত দেড় লক্ষ মানুষ যাতে তাঁর হাতে তৈরি 'রাম হলয়াই' (হালুয়া) তথা 'প্রসাদম' পেতে পারেন সেজন্য যা দরকার তাই করবেন। এক-একবারে প্রায় ৮ হাজার কেজি হালুয়া বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ৭ জানুয়ারি রাতেই চলে এলেন অযোধ্যায়। শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির পুনরুদ্ধার আন্দোলনের সময় অযোধ্যায় এসেছিলেন একজন 'করসেবক' হিসেবে। তারপর এই দ্বিতীয়বার মহানন্দে অযোধ্যায় আসা।

এই 'রাম হলয়াই' বানাতে কি কি জিনিস কত কত পরিমাণে লাগে? তাঁর এই রাম কড়াইয়ের ধারণ ক্ষমতাই বা কত? কোনো রাখঢাক না করে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। কড়াইয়ের ধারণ ক্ষমতা ১২ হাজার লিটার। আর ৮ হাজার কেজির রেকর্ড পরিমাণ হালুয়া বানাতে লাগে ৯০০ কেজি সুজি, ১,০০০ কেজি খাঁটি ঘি, ১,০০০ কেজি চিনি, ২,০০০ লিটার নির্জলা দুধ, ২,৫০০ লিটার জল, ৩০০ কেজি কাজু-কিশমিশ আর ৭৫ কিলোগ্রাম জোট এলাচের গুঁড়ো। ১২ কিলোগ্রাম ওজনের ৮ ফুট লম্বা খুন্তি দিয়ে এই হালুয়া বানানোর জন্য ৫-৬ ফুট, উঁচু মঞ্চের ওপর দাঁড়াতে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা তথা রামোৎসব উপলক্ষ্যে দেশের নানা প্রান্ত থেকে বিশুদ্ধ ঘি এসেছে। তার মধ্যে মহারাষ্ট্রবাসীদের কাছ থেকেই এসেছে ৫ হাজার কেজি।

তিরুপতি লাড্ডু : ত্রেতা যুগের রামচন্দ্র দ্বাপর যুগের নাড়ুগোপালের পূর্বাবতার। তাঁর বালকরূপী শ্রীমূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে। অতএব রাশি রাশি সুমিষ্ট লাড্ডু আসবে না তা তো ভাবাই যায় না। এসেওছে দেশের নানা জায়গা থেকে। অযোধ্যা ছাড়াও দেশের অসংখ্য মন্দিরে সেদিন প্রসাদ হিসাবে লাড্ডু বিতরণ করা হয়েছে। তবে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয় তিরুপতি বালাজী ভেঙ্কটেশ্বর, কাশী বিশ্বনাথ ধাম, উজ্জৈনের মহাকাল এবং মুম্বাইয়ের সিদ্ধি বিনায়ক মন্দিরের কথা। 'তিরুপতি লাড্ডু' এক কথায় ভারত বিখ্যাত। তিরুপতি মন্দিরে যাঁরা যান তাঁদের সবাইকেই 'প্রসাদম' হিসেবে ২৫ গ্রাম ওজনের লাড্ডু প্রদান করা হয়ে থাকে। তাছাড়া এক-একটা ১৭৫ গ্রাম ওজনের 'তিরুপত লাড্ডু' প্রসাদ হিসেবে যে কেউ-ই কিনতে পারেন। যেমন ৫০ গ্রামের এক-একটা লাড্ডু এবং একই ওজনের ঘিয়ে ভাজা নারকেল বরফি কিনতে পাওয়া যায় মুম্বাইয়ের সিদ্ধি বিনায়ক মন্দিরে। তিরুপতি বালাজী ভেঙ্কটেশ্বর পুরাণ বর্ণিত বিষ্ণুর দশাবতারের অন্যতম হিসেবে মান্য না হলেও তিরুপতি মন্দির কর্তৃপক্ষ এবং বালাজী ভক্তরা মনে করেন রামচন্দ্র এবং বালাজী উভয়েই মহাবিষ্ণুর অবতার। সুতরাং ২২ জানুয়ারি জন্মভূমি মন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় বহুখ্যাত তিরুপতি বা ত্রিলোকাধিপতি মন্দির কর্তৃপক্ষ এক লক্ষ 'তিরুপতি লাড্ডু' বিতরণের সিদ্ধান্ত নেন। সেই মতো ২০ জানুয়ারির মধ্যে অযোধ্যায় চলে আসে খাঁটি ঘিয়ে ভাজা এবং খোয়া ক্ষীর, কাজু-কিশমিশ, কর্পূর ইত্যাদি দিয়ে বানানো লক্ষাধিক লাড্ডু। এর বাইরে হায়দরাবাদের ভক্তরা ট্রাকে করে ১ হাজার ২৬৫ কেজি লাড্ডু নিয়ে এসেছেন অযোধ্যায় ২৫ জন মিলে টানা ৩ দিন ধরে ওই সব লাড্ডু বানিয়েছেন। উত্তরপ্রদেশের সীতাপুর থেকে চলে আসে একটা 'লাড্ডুরথ'ও। ২০ হাজার লাড্ডুর ওই রথে আসে শিশু শ্রীকৃষ্ণ তথা নাড়ুগোপালের মূর্তিও। ওই লাড্ডুরথ যখন অযোধ্যার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করতে থাকে তখন অযোধ্যায় আগত সারা দেশ এবং বিদেশের দর্শনার্থীরা তা দেখে যারপরনাই আনন্দিত ও উল্লসিত হন।

অন্যদিকে কাশী বিশ্বনাথ ধাম এবং মধ্যপ্রদেশের মহাকাল কর্তৃপক্ষ ঠিক করেন যে

২২ জানুয়ারি মহানন্দে বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থীর মধ্যে সুস্বাদু লাড্ডু বিতরণ করে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠায় উৎসব পালন করা হবে। সে আবার দু'পাঁচ কি দশ-বিশ হাজার নয়। কাশী বিশ্বনাথ ধাম সেদিন ৩ লক্ষেরও বেশি লাড্ডু বিতরণ করে। আর প্রায় ৫ লক্ষ লাড্ডু বিতরণ করা হয় মহাকাল মন্দির থেকে। কাশীধাম থেকে সরাসরি লাড্ডু বিতরণ করা ছাড়াও সারনাথ এবং চন্দৌলির মন্দিরগুলোতে ২০ হাজার করে পাঠিয়ে দেওয়া হয় সেখানকার দর্শনার্থীদের মধ্যে 'প্রসাদ' হিসেবে বিতরণ করার জন্য। মহাকাল মন্দিরও অমর কন্টকের নর্মদেশ্বর মন্দির-সহ কয়েকটা মন্দির থেকে বিতরণের জন্য লাড্ডু পাঠিয়ে দিয়েছিল।

চাঁদখুরি চাল : ভাগ্নের প্রস্তর মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠার মহোৎসব হবে। সুতরাং তাঁর মাতুলালয় থেকে উপহার তো আসবেই। রামায়ণ গবেষক পণ্ডিতদের মতে ১৪ বছরের বনবাস যাত্রাকালে রামচন্দ্র বর্তমান ছত্তিশগড় প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল দিয়ে গিয়েছিলেন। তাছাড়া শ্রীরামের মামার বাড়িও এই রাজ্যের রাজধানী রায়পুর থেকে ২৭ কিলোমিটার দূরে চাঁদখুরি গ্রাম। সেখানে জন্মগ্রহণ করেন রামমাতা কৌশল্যা। তাঁর নামে একটা মন্দিরও সেখানে রয়েছে। এমনিতে ছত্তিশগড়ে পশ্চিমবঙ্গের গোবিন্দ ভোগ চালের মতো এক জাতের খুব সুগন্ধী চালের জন্য সুখ্যাতি। ইংরেজিতে একে বলা হয় 'aromatic rice'। স্থানীয় লোকেদের কাছে 'চাঁদখুরি চাওয়াল' নামে পরিচিত। এখানকার মানুষরা রামচন্দ্রকে 'ভাগ্নে' মনে করে থাকেন। মামারবাড়ির আদর বলে কথা। সুতরাং সাগ্রহে এগিয়ে আসেন এখানকার চালকল মালিকরা। তাঁদের পাঠানো উপহারের চালে যাতে রামলালার ভোগ রান্না হয়ে প্রসাদ হিসেবে বিতরিত হয় সেজন্য ১১ খানা ট্রাকে করে ৩০০ মেট্রিক টন এই সুগন্ধী চাঁদখুরি চাল অযোধ্যায় পাঠিয়ে দেন তাঁরা। রায়পুরের রামমন্দিরে 'সুগন্ধ চাওয়াল অর্পণ সমারোহ' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানের পর ট্রাকগুলোকে যাত্রা করান ছত্তিশগড়ের নব নির্বাচিত বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই।

অজয় বাণ : হিন্দুদের বিশ্বাস তাঁদের ইষ্ট দেবতা বা ভগবান মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করে ধরাধামে আবির্ভূত হন। সুতরাং মানুষের মতোই বয়ঃক্রম অনুসারে তাঁর শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। মানব থেকে মহামানব এবং মহামানব বা পুরুষোত্তম থেকে দেবত্বে উত্তরণ ঘটে। রামলালাও হলেন শিশু বা বালক রামের প্রতিমূর্তি। পাঁচ-ছ' বছর বয়সী বালকদের হাতে খেলনা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। এখনকার বালকদের হাতে প্রায়শই খেলনা, বন্দুক দেখতে পাওয়া যায়। ত্রেতাযুগের বালকদের হাতে বিশেষ করে সূর্যবংশের রাজপুত্রের হাতে তির ধনুক বা ধনুর্বাণ শোভা পাবে এটাই দস্তুর। সেই ভাবনাকে সামনে রেখে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত রামলালার বিগ্রহের হাতে যেমন তির-ধনুক রয়েছে তেমনি অনেক জায়গা থেকে উপহার হিসাবেও তা এসেছে। সোনা, রুপো, তামা, পিতল এবং লোহা এই পঞ্চধাতু দিয়ে ৫ ফুট লম্বা এবং সাড়ে ১১ কেজি ওজনের একখানা নকসাকাটা 'বাণ' বা তির বানিয়ে পাঠিয়েছে আমেদাবাদের বালকরা। ৮ জানুয়ারি অযোধ্যার উদ্দেশে পাঠানোর আগে ১ থেকে ৭ জানুয়ারি সেই তির যার নাম দেওয়া হয়েছে 'অজয় বাণ' তা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শনীও হয়েছে। মঙ্গলারতির মাধ্যমে স্বাগত জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, যজুর্বেদের 'ধনুর্বেদ' অনুচ্ছেদে প্রাচীনকালে বাণ বা তির তৈরির যেরকম বর্ণনা রয়েছে তাকে অনুসরণ করেই এই 'অজয় বাণ' তৈরি করা হয়েছে বলে জানিয়েছে এইসব ছেলেদের মধ্যমণি দীপেশ প্যাটেল।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে আমেদাবাদের কাছে গব্বর নামের পাহাড়ী এলাকা এবং তার আশেপাশে রামবাণ সম্পর্কে একটা কাহিনি প্রচলিত। সেটা এই রকম— বনবাস যাত্রাকালে রাম এবং লক্ষ্মণ যখন অর্বুদ অরণ্যের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন একজন মুনির সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়। মুনিবর দুই ভাইকে দেবী জগদম্বার কাছে নিয়ে যান এবং দেবী তাঁদের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে দুরাত্মা-দুরাচারীদের নিধন করার জন্য রামচন্দ্রকে অজয় বাণ প্রদান করেন। কালে সেই বাণ দিয়ে রামচন্দ্র রাবণ নিধন করেন। আমেদাবাদের বালকরা উল্লেখিত 'অজয় বাণ' তৈরি করার পর সর্বপ্রথম অম্বাজী মন্দিরে গিয়ে পূজা করে। তারপর অযোধ্যায় পাঠায়।

কেবল এই 'অজয় বাণ' নয়। রামলালার জন্য বিভিন্ন মহল কয়েক বছর আগে থেকেই তির-ধনুক বানিয়ে উপহার হিসেবে সমর্পণ করে আসছে। বাদ যাননি মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষরাও। শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির পুনর্নির্মাণের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার পর পরই উত্তরপ্রদেশের শিয়া মুসলমানদের পক্ষ থেকে ১৪ খানা রুপোর তির বানিয়ে রামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। ওই ১৪টি তির ছিল রামচন্দ্রের ১৪ বছর বনবাসের প্রতীক স্বরূপ। প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় ২.৫ কেজি ওজনের সোনা ও রুপোর তৈরি ধনুর্বাণ উপহার দিয়েছেন পাঠনাবাসীরা। আরও একটা ২.৫ কিলোগ্রামের ধনুর্বাণ বানিয়ে ট্রাস্টের হাতে তুলে দিয়েছেন চেন্নাইয়ের এক রামভক্ত জনার্দন গণেশন। এটি অষ্টধাতুতে তৈরি।

৮০ কেজি ওজনের তরবারি : ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে রাক্ষস প্রবৃত্তির রাবণ নিধনকারী একজন যোদ্ধা হিসাবেও দেখেন মহারাষ্ট্রের একজন রামভক্ত ও ছত্রপতি শিবাজীর অনুরক্ত নীলেশ। হিন্দু সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শিবাজী মহারাজের কোমরে ছোটোবেলা থেকেই তরবারি ঝুলত। সেই অনুপ্রেরণাবশত বালক বয়সি রামচন্দ্রের জন্য ৮০ কিলোগ্রাম ওজনের একখানা তরবারি বানিয়ে উপহার পাঠিয়েছেন নীলেশ। তামার ওপর সোনার জল করা এই তরবারি ৫৪ ইঞ্চি বা সাড়ে ৪ ফুট লম্বা এরকম আরও কত যে বিস্ময় জাগানো উপহার এসেছে তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। যেমন রামচন্দ্রের ঘরে ঢুকে কেউ যাতে তাঁর কোনো ক্ষতি না করতে পারেক এই মনোভাবে ভক্তির অর্ঘ্যরূপে বিহার থেকে এসেছে একটা বিশালাকার তালাচাবি। ১০ ফুট লম্বা চাবিসহ এই তালার ওজন হলো ৪০০ কিলোগ্রাম।

রামঘণ্টা : শ্রীরামজন্মভূমি মন্দিরের জন্য অনেকে নিজের হাতে ঘণ্টা বানিয়ে উপহার দিয়েছেন। তার কয়েকটা মন্দির পরিসরের বিভিন্ন জায়গায় লাগানোও হয়েছে, রামলালার মঙ্গলারতির সময় শঙ্খধ্বনি হবে, ঘণ্টা বাজবে বলে কত যে ঘণ্টা এসেছে বোধহয় গুণে শেষ করা যাবে না। নানা মাপের, নানা ওজনের, নানা আকারের, নানা মাপের ঘণ্টা দান করেছেন নানা জনে। তার মধ্যে কয়েকটা বিশেষ ঘণ্টাও আছে। জন্মভূমি মন্দিরে যে ঘণ্টা লাগানো হয়েছে তার ওজন ২ হাজার ১০০ কিলোগ্রাম। আর একটা বিশেষ ঘণ্টা পাঠিয়েছেন রামেশ্বরমের কারিগরেরা।

সোনা, রুপো, তামা-সহ ৮ রকমের ধাতুতে তৈরি এই ঘণ্টার ওজন ৬১৩ কেজি। অষ্টধাতুর এই ঘণ্টার বিশেষত্ব হলো, এটা বাজতে থাকলে ক্রমাগত নাদব্রহ্ম অর্থাৎ ওঁ ধ্বনি নির্গত হতে থাকবে। উল্লেখিত প্রথম ঘণ্টার গায়ে দেবনাগরী লিপিতে খোদিত হয়েছে— জয় শ্রীরাম। □

শাজাহানকে ধরতে কেন এত নাটক?

বিশ্বপ্রিয় দাস

সন্দেশখালির বেতাজ বাদশা শাজাহানকে অনেক নাটক করে আটক করা হলো। কিন্তু শেষ হলো কী সব কিছু? প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে রাজনৈতিক মহলের অন্দরে। কেন এই প্রশ্ন ওঠা? তার কারণ অবশ্য আছে। আমাদের রাজ্যের প্রতিটি কোণায়, প্রতিটি অঞ্চলে এই শাজাহানের মতো দানব তার দলবল নিয়ে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে লুঠ করে চলেছে সর্বস্ব। বীরভূমের কেষ্টর কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল। যদি প্রতিটি গ্রামাঞ্চলের অন্দরে খোঁজ নেন, তাহলে দেখতে পাবেন, এদের যোগসূত্র কোনো না কোনো ভাবে আগের বাম জমানার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। জামা পাল্টানো সেই সব মুখগুলি, পরবর্তীতে তৃণমূল জমানায় আরও ভয়ংকর হয়ে ওঠে। যার ফল সিন্ডিকেট, কাটমানি, দুর্নীতি ও স্বৈরাচারী দমন-পীড়ন। বাম জমানায় মহল্লা কমিটির-নাগরিক নামে একটি এলাকা ভিত্তিক মাতব্বরের দল ছিল। তারা ঠিক করে দিত এলাকার সব কিছু। সালিশি সভাও বসাতেন তারা। সেই সভায় শাস্তিও দেওয়া হতো। খালি সেই একই কথা, জামা পাল্টেছে, চরিত্র বদলায়নি। সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার একইরকম আছে। বদলেছে শুধু পতাকার রং।

সন্দেশখালির কথায় আসা যাক। স্থানীয় সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে যে শেখ শাজাহান আদতে বাংলাদেশ থেকে আসা এক অনুপ্রবেশকারী। ইটভাটায় কাজ করেছে, কখনও বা টোটোর হেল্পার। তবে ভেড়িতে কাজ করতে করতেই সে হাত পাকায় দুষ্কর্মে। আর সেই সময় সে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে তৎকালীন বাম নেতাদের। খুব সহজেই সেই সময়ের শাসকের হয়ে বাহুবলীর চেহারা নেয় সে। যাই হোক, তৃণমূল জমানায় শাসক দলের নেতাদের ঘনিষ্ঠ হয়ে, দ্বীপাঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকায় দলবল নিয়ে রাজত্ব কায়েম করে তার বাহিনী। কিন্তু এত দুষ্কর্ম করার পর শাসক ঘনিষ্ঠ এই নেতাকে নিয়ে এত নাটক কেন? আবার এই প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে যে আদৌ শাজাহান ধরা পড়েছে তো?

স্থানীয় একটি সূত্র বলছে, শাজাহান শুধুমাত্র একটি প্রতীকী চরিত্র। এর পিছনে আছে বড়ো মাথা। ওই সূত্রটি বলছে, এর খবর জানা গিয়েছে রেশন দুর্নীতির কারণে। আর ইডির হাতে আসা সেই ছোট্ট একটি লেখা যা খাদ্যমন্ত্রী তার মেয়েকে দিয়েছিলেন, সেটা থেকেই আজকের সন্দেশখালির এই ঘটনাবলীর জন্ম।

রাজ্যের শাসক দলের অর্থের জোগান থেকে শুরু করে নানা অপরাধমূলক কাজের ক্ষেত্রে শাজাহানের মতো বাহুবলীরা শহর থেকে রাজ্যের সর্বত্র রয়েছে। তাদের হাত ধরেই শাসকের ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা, সাধারণ মানুষকে দমিয়ে রাখা, আর সর্বস্ব হাতিয়ে নিয়ে এলাকার রাজা সাজা। এটাই এখন বাস্তব। অন্য দিকে শাসক দলের প্রয়োজনে এইসব বাহুবলীরা অর্থ থেকে দুষ্কৃতী সব সাপ্লাই দিয়ে দলকে টিকিয়ে রাখার শপথ নেয়। দল আবার যখন প্রয়োজন হয় সব নিংড়ে নেয়। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে ছুঁড়ে ফেলেও দেয়। বিভিন্ন এলাকায় গোষ্ঠী কোন্দল থেকে শুরু করে, এলাকা দখলের লড়াই চলে সারা বছর।

সন্দেশখালির শাজাহানকে স্থানীয় মানুষ দেখতে পেলেও, কেন পুলিশ দেখতে পেল না, সেটা নিয়েও পরিষ্কার একটা ধারণা সাধারণ মানুষ দিয়েছেন। শাসক দলের কাছে একটা বিশাল এলাকার নিয়ন্ত্রককে সহজে যে পুলিশ ধরবে না, এটা তাঁরা জানতেন। কেননা, পুলিশকে নিয়ন্ত্রণ করত এই শাজাহান। এলাকার শেষ কথা বলার ক্ষমতা ছিল শাজাহান ও তার দলবলের। পুলিশের তরফে কারও কোনো

শাজাহানকে আদালতে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

অভিযোগ নেওয়া হতো না, যতক্ষণ না এই শাজাহানের নির্দেশ আসে। এতটাই ক্ষমতা সে ভোগ করত। সে দলের কাছে এতটাই অপরিহার্য যে স্বয়ং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে শাজাহানের পক্ষে দাঁড়িয়ে সাফাই দিতে হয়েছে। এমনকী তাকে দল থেকে তৎক্ষণাৎ বহিষ্কার না করে, অনেকটা সময় পরে শাজাহান যখন পুলিশের হাতে ধরা পড়ল, তখন তাকে ধরা পড়া না বলে, সাধারণ মানুষের ক্ষোভের হাত থেকে রক্ষা করার তাগিদে জেহাদি-অপরাধী শাজাহানকে সরকারি আতিথেয়তা দেওয়া হলো বলা ভালো। তারপর ৬ বছরের জন্য বহিষ্কার করা হলো। এটা একটা ছোট্ট চাল বলে মনে করছে স্থানীয় মানুষজন। জনরোষ এতটাই তীব্র আকার ধারণ করেছে যে শাসকের কাছে শাজাহান ও তার দলবলকে বাঁচানোর একমাত্র উপায় এই ক্রিমিনালদের পুলিশ দিয়ে রক্ষা করা।

তবে শাজাহানকে ধরতে ৫৫ দিন অপেক্ষা করতে করতেই সাজানো হলো নানা নাটক। যে নাটকের স্ক্রিপ্ট লেখা হয়েছে কলকাতা থেকে। রাজ্য পুলিশের ডিজিকে সেই নাটকের চরিত্র হিসেবে নামানো হলো ময়দানে। স্থানীয় পুলিশ পারত না শাজাহানকে ধরতে। এর প্রমাণ সদ্যই পাওয়া গিয়েছে। তাকে যখন ধরে নিয়ে ভিআইপি মর্যাদায় পিছনে পুলিশের সারি আর সামনে খলনায়কের মতো আঙুল হেলাতে হেলাতে তখন চলেছে শাজাহান। কতটা ঔদ্ধত্য তার! আসলে কেন্দ্রীয় এজেন্সির হাতে যদি সে ধরা পড়ত, তাহলে হয়তো অনেক কিছুই বেরিয়ে পড়ত। সেটা ভেবে, সেই আশঙ্কায় কেন্দ্রীয় এজেন্সির হাত থেকে শাজাহানকে রক্ষা করতে এত নাটক। নয়তো বা সন্দেশখালি এলাকায় থাকা সমস্ত তথ্য-প্রমাণ লোপাট করার জন্য যে সময় দরকার ছিল, সেটাই হয়তো শাজাহানকে দেওয়া হয়েছিল। কখনও সে এলাকায় সন্ধ্যের অন্ধকারে আবার দিনের আলোয় নৌকায় লুকিয়ে বেড়িয়ে, নেপথ্যে দলকে পরিচালনা করে জনরোষকে দমিয়ে

সন্দেশখালির শাজাহানকে স্থানীয় মানুষ দেখতে পেলেও, কেন পুলিশ দেখতে পেল না, সেটা নিয়েও পরিষ্কার একটা ধারণা সাধারণ মানুষ দিয়েছেন।

দেবে বলে ভেবেছিল। কিন্তু সব আশায় জল ঢেলে দেয় দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া সাধারণ ঘরের সব (মান-সম্ভ্রম) হারানো মহিলারা। যারা রুখে দাঁড়িয়ে শত অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে তৈরি হয়ে নেমে এলো রাস্তায়। শাজাহান বাহিনীর প্রতি পুলিশের চরম নিষ্ক্রিয়তার বিপ্রতীপে শাজাহানের এই সন্ত্রাসের রাজত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-আন্দোলনে শামিল সাধারণ গরীব মানুষের ওপর চরম পুলিশি সন্ত্রাস, তাদের বিরুদ্ধে নানা ধারায় ভুয়ো মামলা দায়ের, পুরুষশূন্য গ্রামগুলিতে গভীর রাতে প্রতিটি বাড়ির দরজায় বুটের লাথি, রাত বিরেতে বাড়িতে থাকা মহিলাদের সন্ত্রস্ত করার উদ্দেশ্যে অশ্রাব্য গালিগালাজ, অভিযোগ প্রত্যাহার না করলে সর্বনাশ হতে পারে বলে ভীতি প্রদর্শন ও হুমকি, এমনকী কর্তব্যরত সাংবাদিককে পর্যন্ত রেহাই না দেওয়া, ভুয়ো মামলা সাজিয়ে তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর ও গ্রেপ্তারি— বর্তমান শাসক দল নিয়ন্ত্রিত রাজ্য সরকার দ্বারা প্রশাসনিক ক্ষমতার চূড়ান্ত অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগের কিছু উদাহরণ।

এই জনরোষের বিস্ফোরণ শুধু সন্দেশখালি নয়, সারা রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ধিকি ধিকি ঘটতেও শুরু করেছে। সেটাও শাসকের নজরে এসেছে। ফলে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে এটা যে শাসককে অনেকটাই ব্যাকফুটে ঠেলে দিল, সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সম্প্রতি দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসে আরামবাগ ও কৃষ্ণনগরের সভায় সন্দেশখালি প্রসঙ্গ এনে তুলোধনা করেছেন রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে। তিনি সন্দেশখালির লড়াকু গৃহবধূদের মা দুর্গার সঙ্গে একাসনে বসিয়েছেন। আর যে সম্মান রাজ্যের শাসক দলের দুষ্কৃতীরা লুণ্ঠন করেছে, সেই লুণ্ঠিত সম্মানকে ফিরিয়ে দেওয়ার শপথ নিয়েছেন তিনি ও তাঁর দল। এর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সব মেয়েদের সম্মান রক্ষার জন্য তিনি ও তাঁর দল বিজেপি সর্ব শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে অঙ্গীকার করেছেন প্রকাশ্য জনসভায়।

সম্প্রতি এক চাটুকার সাংবাদিক শাসক দলের সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্রের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। রাজ্যের শাসক দল তাকে অনেক উচ্চাসন দিয়েছিল, সন্দেশখালির ঘটনার পর তিনি যেন সেই আগের মতো আচরণ করছেন। যখন তিনি হয়তো দেখেছেন হাওয়া খারাপ, তার পক্ষে এই ডামাডোলের বাজারে কোথাও আর নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সুযোগ নেই, তখন তিনি এই বাহানা তৈরি করেছেন। তাঁর দলের এক বর্ষীয়ান সাংসদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। যেমন হয়েছিলেন এর আগে সারদা কাণ্ডের সময়। এমনকী তিনি দলীয় সুপ্রিমোকেও কাঠগড়ায় তুলেছিলেন। যাই হোক, এটা রাজ্যের শাসক দলের ঘরের অন্দরমহলের কথা। এখন নবীন-প্রবীণের (পিসি-ভাইপো) এই দ্বন্দ্বে টালমাটাল গোটা শাসক দল। তারপর গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো এতগুলো ঘটনা যা রাজ্যের শাসক দলের মধ্যে ব্যাপক দুর্বৃত্তায়নকে প্রকাশ্যে এনেছে। এবারের নির্বাচনে সব ঘটনাকে সামনে রেখে সাধারণ মানুষ চিন্তা করবেন যে কী সিদ্ধান্ত নেবেন।

জ্ঞানবাপী পুনরুদ্ধারে নন্দী মহারাজের প্রতীক্ষার পরিসমাপ্তি

অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়

সময়টা ১৬৬৪, কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত দশনামি বৃদ্ধগুরু গঙ্গার ঘাটে ধ্যানমগ্ন। সূর্য তখন অস্তগামী, গঙ্গার জল সেই অস্তরাগে গৈরিক। হঠাৎ গুরুর ধ্যানপ্রসন্ন, শ্বেতশুভ্র জটাজুটশ্মশ্রু সমন্বিত মুখের পেশীতে দেখা দিল কম্পন। গুরু দত্তাত্রেয় আজ স্বয়ং এসেছেন তাঁর ধ্যানে, অবগত করাচ্ছেন আসন্ন বিপদ। হঠাৎ চোখ খুলে গেল দশনামি গুরুর। নিজের অজ্ঞাতেই ধ্যানাসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। অকস্মাৎ কোলে থাকা শিবলিঙ্গটি পড়ে গেল জলে। বৃদ্ধ সাধুপ্রবর অস্থির হয়ে জলে নামলেন, খুঁজতে লাগলেন শিবলিঙ্গটি, পাড়ের কাদায় হয়তো আটকে আছে। কিন্তু পেলেন না, জল থেকে হাত তুলতেই দেখলেন কাদা আর রক্তে মাখামাখি হয়ে গিয়েছে তাঁর হাত। হাতের শিথিল চামড়া কেটে গিয়েছে কাদায় পড়ে থাকা ধারালো পাথরে। দশনামি বৃদ্ধগুরু বিপদের পূর্বাভাস পেলেন। ধীরে ধীরে আখড়ার উদ্দেশে রওনা দিলেন। মুখমণ্ডল তখন নির্বিকার উপস্থিত হলেন আশ্রমে।

মহানির্বাণী আখড়ায় শরীরচর্চা করে সাধুরা সবাই জড়ো হয়েছেন মহাকালের সন্ধ্যা বন্দনায়। হঠাৎ কাশীরাজের কনিষ্ঠা পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যা মহামায়া নগ্নপদে উদ্‌ভ্রান্তের মতো এক পত্র হাতে উপস্থিত আশ্রম প্রাঙ্গণে। ভয়ে ও শোক ব্যাকুলতায় অভিব্যক্তিহীন। দশনামি গুরু রাজকন্যাকে দেখে আন্দাজ করে নিয়েছেন যে ততক্ষণে কাশী নরেন্দ্রর কোনো বিপদ ঘটে গিয়েছে। ধীর পদে হাত ধরে রাজকন্যাকে ভিতরে নিয়ে এলেন। সামান্য শুশ্রূষার পর মহামায়া ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লে তিনি পত্রটি পড়তে শুরু করলেন। রাজমাতা দুর্গাদেবী জানিয়েছেন কাশী নরেশ ও তাঁদের একমাত্র নাবালক পুত্রকে বন্দি করে নিয়ে গিয়েছে ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি। রাজমাতা তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা-সহ পুর-নারীদের নিয়ে অগ্নিতে আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত। শুধু তাঁদের সর্বকনিষ্ঠা আর কাশীর প্রাণ অভিমুক্তেশ্বর ও আদি বিশ্বেশ্বরকে যেন রক্ষা করেন তিনি। পত্রটি রেখে ধীরে ধীরে উঠে বাইরে এলেন তিনি। অদূরে চিতাবহ্নির লেলিহান শিখা ধূম্রকুণ্ডলীর সঙ্গে প্রতিস্পর্ধারত। সমস্ত সাধুদের আশ্রম প্রাঙ্গণে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিলেন।

ইসলামি শাসক কুতুবউদ্দিন থেকে আকবর পর্যন্ত সবাইকে পরাস্ত করে এসেছে এই শৈব সৈনিকরা। আবার সেই কর্তব্য আগত। তারা প্রস্তুত। হরহর মহাদেব শব্দে মুখরিত হয়ে উঠল কাশীর আকাশ। অদূরে শোনা গেল জ্যোতির্লিঙ্গ ও স্বয়ম্ভুর শয়নারতির ঘণ্টাধ্বনি। দরজা বন্ধ হলো মন্দির প্রাঙ্গণের।

> **এখন ঔরঙ্গজেবও নেই, কিন্তু ঔরঙ্গজেবের অনুসারীরা এখনও রয়ে গিয়েছে ভারতবর্ষে। তাদের একটা অংশ বামমার্গী বুদ্ধিজীবী, জেহাদপ্রিয় হিন্দু বিদ্বেষী লিবেরাল।**

সেদিনের রাত ছিল বড়ো অন্ধকার। দূরে অর্ধদগ্ধ মৃতদেহ খাওয়া লোভাতুর শ্বাপদের চীৎকার তীব্রতর হচ্ছে। বিশ্বনাথের পুরোহিত বিনিদ্র শয়নে। বারবার মনে হচ্ছে আরেকবার প্রভুকে দর্শন করে আসি। কিন্তু শয়ন দেওয়ার পর সূর্যোদয়ের আগে গর্ভগৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু অজানা ভয় তাঁকে নিয়ে চলল আদি বিশ্বেশ্বরের দ্বারপ্রান্তে। প্রবেশমুখে আচমকা এক ছায়ামূর্তি যেন সরে গেল। মশালের আলোও হঠাৎ হাওয়ায় নিভে গেল। দূরে হায়নার হাড়হিম করা কান্না। নাকে এল তীব্র আতরের গন্ধ। এ গন্ধ পুরোহিতের চেনা, এ যে যবন গন্ধ!

পুরোহিত তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন লোলুপ, বিকৃত বুদ্ধি ঔরঙ্গজেবের যবনসৈন্য যুদ্ধরীতি লঙ্ঘন করে রাত্রিকালে হানা দিয়েছে কাশীর অভ্যন্তরে। কম্পিত বক্ষে গুপ্ত প্রবেশদ্বারের উদ্দেশে রওনা দিলেন পুরোহিত। ভোরের আলো ফুটতে আর কিছুক্ষণ। আরতির প্রস্তুতি শুরু করলেন। বাইরে শুরু হয়েছে আল্লাহু আকবর ধ্বনি এবং মন্দির ভেঙে ফেলার তোপের আওয়াজ। সদরে মুহুর্মুহু করাঘাত। পুরোহিত তখন রাজরাজেশ্বরের দুগ্ধাভিষেকে রত। মন্দিরের পশ্চিম প্রান্ত থেকে ভেসে আসছে ধাতব আওয়াজ। হঠাৎ সশব্দে নড়ে উঠল আদি বিশ্বেশ্বরের সদর দ্বার। আরতির শেষ পর্যায় চলছে। হঠাৎ আছড়ে পড়লো শালের বৃহদাকার দরজা। জ্যোতির্লিঙ্গ বিশ্বেশ্বরকে বুকে চেপে পুরোহিত বিস্ফারিত চোখে দেখলেন। সমগ্র লৌহবর্মে ঢাকা বিশালাকায় যবন একহাতে রক্তমাখা তলোয়ার, অন্যহাতে সদ্যছিন্ন একটি গাভী মুণ্ড। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মন্দির চৌকাঠ। পিছনে কয়েকটি যবন সেনা, আশে পাশের মূর্তিগুলি

নারকীয়ভাবে ভাঙছে আর উল্লাসধ্বনি দিয়ে চলেছে। বিশালাকায় যবন সেনাপতি এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। পুরোহিত এক-পা এক-পা করে পিছিয়ে যাচ্ছেন। আন্দাজ করছেন জ্ঞানবাপী আর কতটা দূরে।

বিশ্বেশ্বরকে নিয়ে পুরোহিত জ্ঞানবাপীতে ঝাঁপ দিয়েছেন। আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিয়ে গাভীর মস্তকটি কুয়োয় ফেলতে উদ্যত হয়েছে সেনাপতি, কিন্তু একটি ত্রিশূল এসে সরাসরি যবন সেনানায়কের কণ্ঠনালীতে বিঁধে গেল অকস্মাৎ। লুটিয়ে পড়লো গাজি। বিস্ফারিত চোখে দেখতে থাকলেন পুরোহিত। স্বল্প পরিধেয় সর্বাঙ্গে ভস্মমাখা জটাধারী সন্ন্যাসীগণ হর হর মহাদেব নাদে যবন সৈন্যদের ধরমুণ্ড আলাদা করছে। পিছু হঠছে ঔরঙ্গজেবের সেনা। তুরঙ্গ খান, মির্জা আলিদের মৃত্যুর পর ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় মুঘল বাদশা ঔরঙ্গজেবের সেনা।

দশনামি অঘোরিদের কাছে পরাস্ত হয়ে ফিরে গেল ঔরঙ্গজেবের অবশিষ্ট সেনা। কিন্তু ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল আদি বিশ্বেশ্বরের ক্ষেত্র। তখন দেবী পার্বতী ও স্বয়ম্ভু অভিমুক্তেশ্বরের মন্দির একমাত্র রক্ষা পেয়েছে। নিত্য পূজা করেন অঘোরি দশনামি বৃদ্ধগুরু। কাশী তখন জনশূন্য। ঔরঙ্গজেব এই পরাজয় মেনে নিতে পারেনি। পাঁচ বছর পর ১৬৬৯-এর সেপ্টেম্বরে আবার ফরমান জারি করল এই মুঘল বাদশা। বিকৃতমনস্ক বাদশা পরাজয়ের গ্লানিতে আরও বিকৃত হয়ে উঠেছে। এক সন্ধ্যায় নামাজের পর গাজিদের নিয়ে বসলো গোপন ছক কষতে।

সেদিন ছিল প্রাক আশ্বিনের সন্ধ্যা। হঠাৎই মুহুর্মুহু তোরের আওয়াজে ভেঙে পড়লো অভিমুক্তেশ্বর ও সংলগ্ন মন্দিরগুলি। মহানির্বাণী আখড়ায় তখন রক্তের স্রোত। নামহীন সাধুদের ছিন্নভিন্ন শরীর সর্বত্র। কিছুই আলাদা করে চেনা যায় না। শেষ হলো কাশী বিশ্বেশ্বরের সামগ্রিক ধ্বংস! এক দ্বাদশীর দিন জ্ঞানবাপীর উপর তৈরি হলো মসজিদ। তার তলায় চাপা পড়লো পার্বতী মন্দির-সহ অভিমুক্তেশ্বর স্বয়ম্ভু লিঙ্গটি। তারপর কয়েক শতক কেটে গিয়েছে। এখন ঔরঙ্গজেবও নেই, কিন্তু ঔরঙ্গজেবের অনুসারীরা এখনও রয়ে গিয়েছে ভারতবর্ষে। তাদের একটা অংশ বামমার্গী বুদ্ধিজীবী, জেহাদপ্রিয় হিন্দু বিদ্বেষী লিবেরাল। এছাড়াও আছে প্রচুর বৈদেশিক ভারত বিদ্বেষী সংস্থা।

স্বাধীনতার আগেও হিন্দু সাধুরা জ্ঞানবাপীতে পূজা করতেন। স্বাধীনতা পরবর্তী অধ্যায়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু জ্ঞানবাপীর অভ্যন্তরে নিষিদ্ধ করেন হিন্দু সাধুদের প্রবেশ, আনেন ভয়ংকর কিছু আইন, নাগা সন্ন্যাসীদের উপর নিষেধাজ্ঞা। ১৯৯৩ সালে উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিংহ যাদবের সরকার জ্ঞানবাপীর প্রথম তল বা বেসমেন্টে 'ব্যাসজী কা তহখানা'য় কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের পুরোহিত ব্যাস পরিবারের তরফে চলা পূজার্চনার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। স্বাধীন ভারতে আজও হিন্দু সন্ন্যাসী হত্যা হয় বিজন সেতুতে, পালঘরে। ভারত ছাড়াও পাকিস্তান - আফগানিস্তান - বাংলাদেশে কত শত মন্দির ভেঙে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। জেএনইউ-যাদবপুরে হিন্দুমুক্ত ভারতের আহ্বান জানিয়ে বাম-জেহাদি আন্দোলন চলে। ঔরঙ্গজেব আজও বেঁচে আছে এই ভ্রষ্ট, সেক্যুলার রাজনৈতিক নেতা, জেহাদি সংগঠন ও ধ্বংসাত্মক বামপন্থী মতাদর্শের মধ্যে।

২০২১ সালের ১৮ আগস্ট পাঁচ জন বীরাঙ্গনা লক্ষ্মী দেবী, সীতা সাহু, মঞ্জু ব্যাস, রেখা পাঠক ও রাখী সিংহ— জ্ঞানবাপীর শৃঙ্গারগৌরীতে উপাসনার অধিকার প্রার্থনা করে বারাণসী আদালতের দ্বারস্থ হন। এই মামলার প্রেক্ষিতে সম্প্রতি আদালতে জমা পড়া আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার সমীক্ষা রিপোর্ট পর্যালোচনা করে গত ২৬ ফেব্রয়ারি এলাহাবাদ হাইকোর্ট তার রায়ে জ্ঞানবাপীর দক্ষিণ দিকের এই গর্ভগৃহে হিন্দুদের পূজা-উপাসনার অধিকার বহাল রেখে আঞ্জুমান ইন্তেজামিয়া মসজিদ কমিটির তরফে দায়ের করা আপিলটিকে খারিজ করে দিয়েছে।

১৯৯৩ সালে মুলায়ম সিংহ যাদব সরকারের সেই নির্দেশ হিন্দুদের প্রতি অন্যায়-অবিচারের উদাহরণ বলেও হাইকোর্টের সাম্প্রতিক রায়দানে প্রতিভাত হয়েছে। ভারত জুড়ে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তিতে হিন্দুদের একমাত্র হাতিয়ার যা আগামীদিনে করবে জ্ঞানবাপীর প্রতি মুখ করে ভগবান বিশ্বেশ্বরের আত্মপ্রকাশের অপেক্ষারত বিশ্বনাথ অনুষঙ্গী নন্দী মহারাজের প্রতীক্ষার অবসান। ভব্য জ্ঞানবাপী, পবিত্র জ্ঞানবাপী প্রাপ্তি হোক আগামীদিনের অগণিত শিবভক্তদের হার্দিক আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা।

ব্যাঙ্গালোরের রামেশ্বরম কাফে বিস্ফোরণের ঘটনায় ধৃত জেহাদি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ৩ মার্চ অন্ধ্রপ্রদেশের কাদাপা জেলার মইদাকুরু থেকে স্থানীয় পুলিশ আব্দুল সেলিম নামক এক জেহাদিকে গ্রেপ্তার করেছে। কর্ণাটকের ব্যাঙ্গালোরের হোয়াইটফিল্ডে রামেশ্বরম কাফেতে সাম্প্রতিক আইইডি বিস্ফোরণে ১০ জন গুরুতর জখম হন। এই বিস্ফোরণের পিছনে হাত রয়েছে গ্রেপ্তার হওয়া এই জেহাদির। পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া বা পিএফআই নামক সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের উত্তর তেলেঙ্গানার সেক্রেটারি ছিল এই আব্দুল সেলিম। ভারত বিরোধী জেহাদে অংশগ্রহণের জন্য সে মুসলিম যুবকদের রিক্রুট করত এবং অস্ত্র প্রশিক্ষণ-সহ জেহাদি ট্রেনিঙের উদ্দেশ্যে তাদের ট্রেনিং ক্যাম্পগুলিতে পাঠাত।

ধৃত আব্দুল সেলিম

তেলেঙ্গানার নিজামাবাদ থানায় ২০২২ সালের জুলাইয়ে দায়ের হওয়া একটি মামলায় সে ছিল অন্যতম অভিযুক্ত। সেই বছরের আগস্ট মাসে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির কাছে মামলাটি স্থানান্তরিত হয়। গত ২ বছর ধরে সে ছিল পলাতক, তার গ্রেপ্তারির লক্ষ্যে ঘোষিত পুরস্কার মূল্য ছিল ২ লক্ষ টাকা। ভারত বিরোধী ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত আব্দুল সেলিম নিষিদ্ধ জেহাদি সংগঠন পিএফআই-এর একজন সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।

জ্ঞানবাপীতে পুজোপাঠ চলবে, খারিজ মুসলিম পক্ষের আপিল

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। জ্ঞানবাপী মামলায় বড়ো জয় হিন্দুপক্ষের। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি এলাহাবাদ হাইকোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, জ্ঞানবাপীর 'ব্যাসজী কা তহখানা'য় পুজোপাঠের পাশাপাশি আরতি করতে পারবেন হিন্দুরা। এদিন মুসলিম পক্ষের তরফে দায়ের করা আপিল খারিজ করে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি রোহিতরঞ্জন আগরওয়ালের সিঙ্গল বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে।

ঘটনা হলো, বারাণসী জেলা আদালত আগেই তার নির্দেশে জানিয়েছিল, জ্ঞানবাপীর তহখানায় হিন্দুরা পুজো ও আরতি করতে পারবেন। নিম্ন আদালতের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে অঞ্জুমান ইন্তেজামিয়া মসজিদ কমিটি এলাহাবাদ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। সেই আর্জি খারিজ করে হাইকোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, জ্ঞানবাপী চত্বরের দক্ষিণদিকে 'ব্যাসজী কা তহখানা'য় পুজোপাঠ করতে পারবেন হিন্দুরা। প্রত্যাশিত এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন হিন্দুপক্ষের আউনজীবী বিষ্ণুশঙ্কর জৈন।

এর আগে বারাণসী নিম্ন আদালতের নির্দেশের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই জ্ঞানবাপীর সিল করা তহখানায় পুজো শুরু করে দেন হিন্দুরা। বারাণসী জেলা আদালতের বিচারক অজয়কুমার বিশ্বেশ সেখানে পুজোর অনুমতিপ্রদান করেন। এরপরই দৈনিক ৫ দফা আরতি ও পুজোপাঠ শুরু হয়ে যায় জ্ঞানবাপীর ওই নির্দিষ্ট অংশে। ভোর সাড়ে তিনটেয় 'মঙ্গলা', দুপুর ১২টায় 'ভোগ', বিকেল চারটেয় 'অপরাহ্ণ', সন্ধে ৭টায় 'সায়াহ্নকাল' এবং রাত সাড়ে ৮টায় 'শয়ন' উপাচারের মাধ্যমে প্রতিদিন পূজার্চনা চলছে। ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত ব্যাসজী কা তহখানায় পুজো করেছেন বলে নিম্ন আদালতে জানিয়েছিলেন 'ব্যাস' পুরোহিত বংশের এক পুরোহিত। হিন্দুপক্ষ আদালতে আরও জানিয়েছে, ১৫৫১ সাল থেকে এই 'তহখানা'র মালিকানা রয়েছে ব্যাস পরিবারের হাতেই। অযোধ্যায় বিতর্কিত ধাঁচা ধ্বংসের কয়েক মাস পর সেখানে পুজো বন্ধের নির্দেশ দেয় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিংহ যাদবের অধীন উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন।

এই সমস্ত যুক্তি তুলে ধরেই ওই স্থানে পুজোর জন্য আবেদন করা হয় ব্যাস পরিবারের তরফ থেকে। পাশাপাশি স্থানীয় পাঁচ জন হিন্দু মহিলার তরফেও আদালতে পুজোর জন্য আর্জি জানানো হয়েছিল। সেই আবেদনগুলি একত্র করেই নিম্ন আদালত জ্ঞানবাপীতে এএসআই (ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ) সমীক্ষার পাশাপাশি আরতি ও পুজোপাঠের নির্দেশ দেয়।